উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবিতা

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা:) লি:
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
এস্. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা:) লি:
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
পূর্ণেন্দু পত্রী
অলংকরণ
মলয়শংকর দাশগুপ্ত
পবিত্র দাস (পৃ: ৮৮)

প্রথম সংস্করণ
কার্তিক
১৩৬০

অনু ও বুদ্ধদেব-কে

সম্পাদকের নিবেদন

বাংলা সাহিত্যে উত্তরবঙ্গ তার ঐতিহ্য নিয়ে এখনো বিরাজমান। কবিতায় অবশ্য তেমন মূল্যায়ন এখনো হয় নি। এখানকার কবিতা পড়তে পড়তে স্বভাবতই মনে আসে পশ্চিমবাংলার অন্যান্য অঞ্চলের কবিতা থেকে উত্তরবাংলার কবিতায় কোথায় যেন একটা পৃথক সত্তা লুকিয়ে আছে। পরিবেশগত দিক থেকে উত্তরবঙ্গের নৈসর্গিকতার ছাপ প্রায় কবিতায় স্পষ্ট প্রতীয়মান। চিত্রকল্প, প্রতীক উঠে এসেছে হয়তো কোন পাহাড়ী উপত্যকার খাঁজ থেকে কিংবা পাহাড় চূড়ায় খেলা করা মেঘের দৃশ্যাবলী থেকে। মাঠ, ফসল, অন্ধকার, ঘাই দেওয়া নদীর স্রোত, নেমে আসা জলপ্রপাত সহজ ভাবে কলমের ডগায় প্রতীকী হয়ে উপস্থিত হয়। এককথায় বলা চলে উত্তরবঙ্গের কবিতা নিজস্ব চেতনায় উজ্জ্বল। এই ভাবধারাকে গ্রথিত করবার প্রচেষ্টা 'উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবিতা'।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও বইয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কবিতা থেকেই সংকলনের কবিতাগুলো নির্বাচিত করা হয়েছে। কবিতা নির্বাচনে আমার ব্যক্তিগত পক্ষপাত যাতে সংকলনটির মর্যাদাহানি না ঘটায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে কবির নিজস্ব স্বাধীনতা ও মতামতকে যথাসম্ভব গুরুত্ব দিয়েছি। কোনও একটি বিশেষ অংশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে বরং সবরকমের কবিতা ছড়িয়ে দিতে পারায় আসল চেহারাটি ফুটে বেরিয়েছে। উত্তরাঞ্চলে বসবাস করেন এমন কবিদের মোটামুটি একটি পরিচয় পাবার পক্ষে এই সংকলনখানি অনেকটা অভাব পূরণ করতে সক্ষম হবে বলে মনে করি।

অন্তঃশীলা ফল্গুধারার মতো উত্তরাঞ্চলের মাটি, আকাশ আর মুক্ত হাওয়া কবিতার মধ্যে নিবিড়তায় মিশে আছে, ফলে এই কবিতাগুলো শৃঙ্খলের বেড়ি পায়ে জড়িয়ে বিচরণ করেনি, কিংবা নয় বিবেকের কাছে বাধা। কোনও পাঠক যদি আনন্দের সঙ্গে একটি কবিতা পড়ে শেষ করতে পারেন তবেই তো সবচাইতে বড় লাভ। যদি একটু অনাস্বাদিত আনন্দ, গভীরতম বোধ যদি কাজ করে ভেতরে, তবেই হবে আমার পরিশ্রম সার্থক। আধুনিক কবিতার জটিলতার মধ্যে আমি যেতে চাই না। এত কথা বলতে হলো, এই কারণে যে বাংলার সব কবিই এক জগতের অধিবাসী নন। উত্তরবঙ্গের কমবেশী প্রায় সকল কবিই উত্তরবঙ্গের নৈসর্গিক জগতে বিচরণ করেছেন। তুলে এনেছেন লোকজ উপাদান যাকে জানতে হলে, উপলব্ধি করতে হলে পাঠককে এই অঞ্চলের সঙ্গে সম্যক পরিচিত হতে হবে। চড়াই উৎরাই পাহাড় বেয়ে সারা জীবন ধরে ঘুরলেও এক ফোঁটা জল পাওয়া যাবে না, কিন্তু পায়ের নীচে, ঢালে, পাতার ফাঁকে গাছের আড়াআড়ি শিকড়ের নীচে যে জলধারা বয়ে চলেছে তার হদিশ বাইরে থেকে পাওয়া সহজ নয়। এই কারণে এর পরিচয় আগে জানতে হবে, জানতে হবে উৎস ও প্রবাহিতের স্থান এবং সময়। উত্তরবঙ্গের কবিতা এই পাহাড়ী ঢালে, লোকচক্ষুর অন্তরালে বয়ে যাওয়া জলধারা। "উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবিতা" তাই প্রথম নতুন সুর, স্বতন্ত্রভাবে নতুন—একে অনুভব করা যায়, জটিল চুল-চেরা বিচার করা যায় না। এই সংকলন গ্রন্থ করতে গিয়ে স্থানাভাব ও যোগাযোগের অসুবিধার জন্য কয়েকজন কবিকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি নি, পরবর্তী সংস্করণে এই গণ্ডি অতিক্রম করা যাবে বলে মনে করি।

অপরিসীম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতেই হয় অগ্রজ কবি শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও কবি শ্রীসুব্রত রুদ্র ভূমিকা লিখে দেওয়ার যে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন, তাতে সংকলনখানির যে মূল্য বৃদ্ধি পেল, তার অনেকখানি অপূর্ণ থাকতো। প্রচ্ছদ করে দিয়েছেন

শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী। নানা সৃজনশীল কাজে ব্যস্ত থেকেও এঁরা যেভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন, সে জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ।

শ্রীরণজিৎ দেব, শ্রীঅরুণ দে, শ্রীহরেন্দ্রনাথ দাস, সহকর্মী শ্রীতপন সেন ও আরো অনেকে এই গ্রন্থ প্রকাশে নানা ভাবে সাহায্য করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

পরিশেষে নিউ বেঙ্গল প্রেসের শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই গ্রন্থ প্রকাশে তাঁর উৎসাহ ও সহায়তা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

সংকলন কার্যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি চোখে পড়লে সহৃদয় পাঠক যদি সেগুলো আমার দৃষ্টিগোচর করেন তাহলে বিশেষ অনুগৃহীত বোধ করব।

ব্যাঙচাতরা রোড
কোচবিহার : ৭৩৬১০১

বিশ্বনাথ দাস

ভূমিকা

উত্তরবঙ্গের কবিতা-দক্ষিণবঙ্গের কবিতা কিংবা পূর্ববঙ্গের কবিতা-পশ্চিমবঙ্গের কবিতা, এরকম ভাগাভাগি আমি মানি না। এ রকম গণ্ডি দিয়ে ঘিরতে গেলে ক্রমশই সংকীর্ণ হয়ে যেতে পারে কাব্যের জগত। শেষ পর্যন্ত, শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির কবিতা বা উত্তর কলকাতা-দক্ষিণ কলকাতার কবিতা পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়াও বিচিত্র নয়। এরকম ভাবে কবিতার মাঝখানে দেওয়াল তোলা যায় না। বাংলা ভাষায় যে কবিতা লেখা হবে, তা সবই বাংলা কবিতা, সেই সমভূমিতেই প্রত্যেক কবিকে দাঁড়াতে হবে।

অনেক সময় মূলভাষা ছাড়াও কিছু কিছু আঞ্চলিক ভাষাতেও কবিতা রচিত হয়, তার আলাদা একটা স্বাদ থাকে। বক্ষ্যমান সঙ্কলনটি সে-রকম আঞ্চলিক ভাষারও নয়। জন্ম ও কর্মসূত্রে উত্তর-বঙ্গের কয়েকটি জেলায় যে সব কবিদের বসবাস, তাঁদের কবিতা স্থান পেয়েছে এতে। উত্তরবঙ্গের সংগে বাকি বাংলার যোগাযোগ এখনও খুব সহজ সাধ্য নয়, এই জন্য সেখানকার মানুষ কলকাতা কেন্দ্রিক সংস্কৃতি থেকে খানিকটা বিচ্ছিন্ন বোধ করেন, সেই অভিমান থেকেই হয়তো এই রকম সংকলনের উদ্যোগ। মহানগরীর বুদ্ধিজীবীরা বৃহৎ বঙ্গের সাহিত্য-শিল্প সম্পর্কে অনবহিত বা উদাসীন, তাঁদের অহমিকায় কঠিন আঘাত দেবার জন্যও এমন কোন সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রেরণা আসতে পারে।

সে যাই হোক, এই সংকলনের কবিতাগুলি আমি মুক্ত ও খুশি কণ্ঠে বলতে পারি, এই কবিতাগুলিতে আঞ্চলিকতা বা বিচ্ছিন্নতাবাদের চিহ্ন বিন্দুমাত্র নেই। এই কবিদের মধ্যে কেউ-ই নিছক উত্তরবঙ্গের কবি নন, সবাই বাঙালী কবি।

সাতাশজন কবি উপস্থিত এখানে, এঁদের মধ্যে প্রবীণতমের বয়েস ৫৯, নবীনতমের বয়েস ২৪। সব কবিরই কবিতায় তাঁদের জন্মস্থান ও কৈশোর জীবনের পটভূমির অনুসঙ্গ ফিরে আসে বারবার। উত্তরবঙ্গের অধিবাসী এই কবিদের কবিতাও যে পাহাড়, জঙ্গল ও উন্মুক্ত নদীগুলির ছবি ফিরে আসবে বারবার, সেটাই তো স্বাভাবিক। সেই জন্য এই সংকলনের প্রথম কবিতাটি পাহাড়তলি নিয়ে (জগন্নাথ বিশ্বাস), একটু পরেই পাই বাড়ির উঠোনে রাত্রি-বেলা বাঘের জল খেতে আসার দৃশ্য (বেণু দত্তরায়), অপরাজিতা গোপ্পীর কবিতায় পাই তোর্ষা নদীর কথা। এই সব টুকরো টুকরো উল্লেখ কবিতাগুলিকে আলাদা সৌরভ দিয়েছে। অবশ্য তরুণদের লেখায় প্রকৃতি ঠিক এমনভাবে আসে না, তাঁদের কাছে প্রকৃতি শুধু দৃশ্য নয়, অনেকখানি বিমূর্তও বটে।

সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ দাসকে ধন্যবাদ জানাই, তিনি আমাদের একখানি বেশ ভাল কবিতার সংকলন উপহার দিয়েছেন। এই কবিদের অনেকের লেখাই আগে পড়েছি। উঁচু বাংলার অনেক লেখা একসঙ্গে পড়তে পেয়ে আরো ভাল লাগলো। অবশ্য ওদিককার কেউ বাদ পড়ে গেছেন কি না, আমি বলতে পারবো না, পারলেও বলবো না, কারণ ভূমিকা লেখকের সমালোচকের ভূমিকা নেওয়ার রীতি নেই! প্রত্যেক সংকলন সম্পর্কেই কিছু বিতর্ক হয়, যত বেশী বিতর্ক হয় ততই ভালো, তবে কঠোর সমালোচকের ইঁট-পাটকেল সম্পাদককেই সহ্য করতে হবে, ভূমিকা লেখক নিরাপদ দূরত্বে থাকতে চায়। কবিতাগুলি পড়ে আমি আনন্দ পেয়েছি, সেই কথাটাই আবার বলতে চাই।

এখানে কেবল পাওয়া যাবে উত্তরবঙ্গে যাঁদের জন্ম অথবা বহুদিন উত্তরবঙ্গে বসবাস করছেন এমন সাতাশ জন কবির একশোর ওপর কবিতা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কবি-পরিচয়।

কবিদের প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতার এরকম একটি বই ছাপা হলো বন্ধুবৎসল প্রবীরকুমার মজুমদারের আগ্রহে আর, বিশ্বনাথ দাসের পরিশ্রমে। দুজনকেই ধন্যবাদ জানাই।

সূচীপত্র

উত্তর বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবিতা

বিশ্বনাথ দাসের অন্যান্য গ্রন্থ :

শব্দের আগুনে (কবিতা)

প্রাণে কেউ জেগে নেই (কবিতা)

প্রকাশিতব্য :

উত্তরবঙ্গের দেব দেউল (প্রবন্ধ)

উত্তরবঙ্গ সংস্কৃতি পরিক্রমা (যুগ্ম-সম্পাদনা)

স্থির চিত্র (কবিতা)

জগন্নাথ বিশ্বাস (১৯২৪)

পাহাড়তলি

ঐ ঢালু জমিটার ওপারে
একমুঠো চমক অপেক্ষমাণ।
চিলৌনি গাছের ছায়া পড়েছে
পাহাড়ী গরুদুটোর গায়ে
একমনে ঘাস খাচ্ছে ওরা,
ওপাশের পাহাড় বাদামী-সবুজ—
এক-গা হলুদ রোদে
নিঃসঙ্গ বন্ধুর মতো গৈরিক গম্ভীর।
ছায়ার ওপিঠে যেন একদল ছায়ার ভালুক
রোমশ, খেলছে নমনীয়···
নখের আভাস।

না, আমার টলেনি বিশ্বাস।

গাছ

I stood 'till and was a tree amid the wood

—Ezra Pound

বিশাল বনের রাজ্যে আমি এক নিস্তব্ধ উদ্ভিদ,
অনেক অজ্ঞাত কথা উদ্‌ভাসিত হয়েছে আকাশে,
অনেক জলের শব্দ, জটিলতা, যজ্ঞের সমিধ
অনেক মাটির কান্না আছে শিকড়ের কাছে।
অহল্যার শোক নেই, বীতশোক, জংগম পাষাণে
শুনেছি নিঃশ্বাস তার, অন্ধকার দেবতার তারা
যখন অস্ফুট হয়, বাতাসের নিঃশব্দ আহ্বানে
দেবতার গল্প শোনে, আমি থাকি নিস্তব্ধ পাহারা।
রাত্রির নিবিড় কানে, সূর্যালোকে, রহস্য সবুজে,
যে জন রভসে মত্ত ছায়াঘন পাতার শিবিরে
তেমনি ছিলাম আমি সংগোপনে ঘর নিয়ে খুঁজে
শিকড় ধরিয়ে দিয়ে চারিদিকে অনেক গভীরে।
এবং অনেক সত্য উদ্‌ভাসিত হয়েছে আকাশে,
অনেক জেনেছি আমি গাছের ভিতরে গাছ হয়ে।

শীত

হতশ্রী শীতের দিন। ধোঁয়া নীল বিশ্রী অন্ধকার
নগরী আকাশ ক্লান্ত, নিচু হয়ে ছুঁয়েছে প্রাচীর;
শরীরে ব্যথার ভার, মনেরও মাটীতে লাগে চিড়
পৃথিবীতে ছোঁয়া লাগে রিক্ততার, অবসন্নতার।

যদিও উজ্জ্বল দিনে হৃদয়ে নেমেও থাকে ভার—
তবু তার মনে আছে। কিন্তু আজো ছাখো প্রকৃতির
পরিহাস কি নির্মম! ছেয়ে আছে নগরীর তীর
প্রত্যুষের ম্লানতায়! এর কোন ক্ষমা আছে আর?

সূর্য প্রেমিক আমি। মনে পড়ে আলোর প্রয়াস
সকাল পাহাড় ঘেঁষে, তুপুর মাঠের কিনারায়
কলস্বরে মুখরিত করেছি তো মাঠের বাতাস
আলোর খেলায় মত্ত। ভাবি আজ রিক্ত ম্লানতায়
এ ক্লান্তির শেষ আছে? আছে কোন নতুন আশ্বাস
শুনিতো রাত্রির গর্ভে যাত্রী জাগে দিনের আলোর।
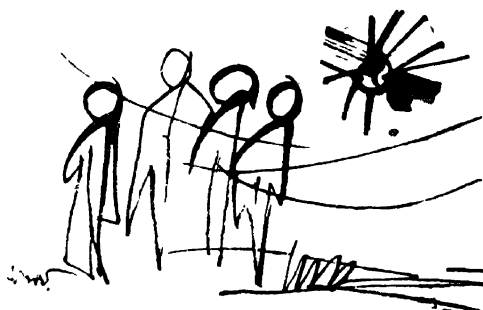
বেণু দত্তরায় (১৯২৮)

মানুষটা

মানুষের কাঁধে চড়ে চলে যাচ্ছে
মানুষটা
সোনার পালংকে ছিল সুখদুঃখ
ফুলের বাগান জুড়ে স্বপ্নসাধ
তার পরমায়ু
রৌদ্রে জলে গাঁথা ছিল

নদীর পাড়ের দিকে এখন পড়ন্ত বেলা
ছাতিম গাছের ছায়াটা নদীর জলে
খুব ঘন হয়
মানুষটা বলেছিলো—
"ফিরে আসবো"
ফিরে আসতে চেয়েই
এখন সে চলে যাচ্ছে
মানুষের কাঁধে চড়ে
সুখ-দুঃখ-জন্ম-জন্মান্তর ভেঙে
শাঁখা ভেঙে বসে আছে নারী
খুব কাছে থেকে এই
চলে-যাওয়া ছাখে।

বাঘ জল খেতে আসে

বাঘ জল খেতে আসে
আমার উঠোনে

সারারাত্রিই
ভূতুড়ে ফুলের গন্ধ
নরম পাউডারের মতো ধুলো
উজানে উজানে

তুখোর
নদী সাঁতরে
বাঘ জল খেতে আসে
আমার উঠোনে
কোন আগল থাকেনা
আমার দেউড়ি
খোলাই থাকে
সারারাত্রিই
কলতলায় কুলগাছের ছায়া
পড়েছে

সাবেক
পাত্‌কুয়োর ধারে
ঠাণ্ডা
মিঠে জল
আমরুল পাতা দুব্‌বো ঘাস

বাঘ জল খেতে আসে
আমার উঠোনে

একদিন

একদিন ঘুম আসবে তার জন্যে জেগে থাকবো একদিন
সত্যি-সত্যি ঘুম আসবে হাওয়ায় হলুদ বটপাতা উড়ে যাবে···
একদিন বেড়াতে-বেড়াতে মাঝরাত্রে ইজেলের ধারে সমুদ্রে
বালির নরম তাপে ঘুমিয়ে পড়বো···রাত-পাখির ডাক
এমন মধুর হ'তে পারে আর কখনো শুনিনি···লিখতে-লিখতে
চেয়ার থেকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখবো···ঘুম আসছে···যেমন
মাঝরাত্রে ডাক-বাংলোর চালে শিশির পড়ে···আমি চৌকিদারকে
ডাকবো জ্যোৎস্না হ'লে, ছাখ ছাখ বাগানে একটা হলুদ
প্রজাপতি,···এখন আমার কফির কাপ জুড়িয়ে জল হচ্ছে
আমার টেবিলে তেমনি গোছানো থাকলো জল-ঢাকা গেলাশ
কয়েকটা আলপিন···যদি আমার সত্যি-সত্যি ঘুম আসে যদি

বকুল

রাত হলে খুব কোকিল ডেকেছিল শ্মশানে
আমরা কেউ কোকিল দেখতে পাইনি,
শুধু আমরা চারবন্ধুতে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছিলুম
আমাদের পায়ের তলায় ছিল নদী, অন্ধকারে ভরা।
আমরা কেউ নদী দেখতে পাইনি
শুধু ছলছল্ খলখল্ করছিল।
এমন সময়, হঠাৎ আমাদের মাথার উপরে বকুল ঝরে পড়ল।
আমরা কেউই জানিনি, শ্মশানেরও গাছে ফোটে বকুল।

কিংবদন্তী

সারারাত হাওয়ায় পুরানো শিমুল-বীজ খসে যায়! তার
জন্মের বৃত্তান্ত। বুড়ো
পাহাড়টাও জানে আদুল-গায় শীত-গ্রীষ্ম
বাঁধানো পাথর ভেঙে উঁচু থেকে আরও উঁচুতে
উঠে-যাওয়া এইসব প্রাণের বীজ
জড়ো করে খেলা। এইসব রোদ্দুর-মেঘ-রঙ
মুখে মাখা। অদৃশ্য ঘন্টি বাজে বাজারের ধারে।

একদিন আমরাও উত্তরে যাবো। বুড়ো
পাহাড়টার কাছ থেকে
কিনে আনবো জরিবুটি মশলাপাতি আনাজ রোদ্দুর
আমাদের অন্তর্গত রক্তে
জ্বলবে এলাচ-লবঙ্গ-জায়ফল, আমরাও
পুরন্ত শিমুলবীজ থেকে মেখে নেবো
রক্তিম রৌদ্র, আর বুড়ো পাহাড়টা
আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে হেঁটে যাবে অনেকদূর
কোনোদিকেই না তাকিয়ে, কাউকেই
কিছু না বলে আমরাও সঙ্গে-সঙ্গে যাবো

স্বগত

ফুল
দিতে চাইলাম মেয়েটিকে,
ফল
দিতে চাইলাম কাজল-ভোমরা নদীকে—
না, কেউ না
না, কেউ না
ফুল ও ফল তারা কেউ নিল না।

প্রেমিকের হাত ভ'রে দিতে চাইলাম
রাঙাফুল,
মহুয়ার নেশায় তার চোখ ঢুল্‌ঢুল্‌—
বলে উঠলো স্বপ্নে,
ফিরিয়ে নে ফিরিয়ে নে

আসলে
নিতে কেউ জানে না। দিয়ে-দিয়ে
দু' হাতে ভরে ফিরিয়ে-নেওয়া···
কেবলই ফিরিয়ে

ছায়ার মতো চৈত্রের চাঁদ

দ্যাখ ছায়ার মতো নেমে যাচ্ছে চৈত্রের চাঁদ পাহাড় থেকে
গুড়ি মেরে-মেরে
একদিন আমাদের একটাই নিকেলের মতো চাঁদ ছিল
আমরা এখন প্রতিদিন নিরালায় থাকি ও ঘুমোতে যাই

আমাদের বুকে
    দেবদারু ও পাইনের ঝাড় ঝোড়ো হাওয়া দোলে
আমাদের চোখে ঢের স্বপ্ন ছিল—
    সাতরঙা ফানুষের পরমায়ু পুষে
এখন আমরা পাহাড়-চূড়া থেকে নেমে-যাওয়া চাঁদ
                        বিখ্যাত প্রতিদ্বন্দ্বী
গুড়ি মেরে-মেরে নেমে যাচ্ছে আমরা দাঁড়িয়ে দেখি
ছায়ার মতো নেমে যাচ্ছে চৈত্রের চাঁদ।

অপরাজিতা গোষ্ঠী (১৯৩১)
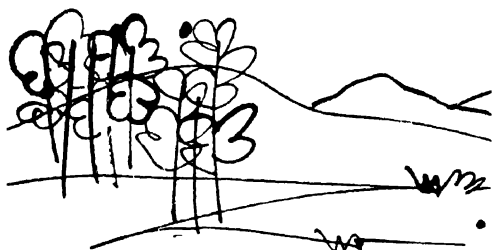
সামনে উত্তাল তোর্ষা

সামনে উত্তাল তোর্সা,
চারিদিকে হোগ্‌লার বন,
অজানা আশঙ্কায় পায়ে চলা
পথ দিশেহারা।

মাথার ওপর ফেনার মত
মেঘের আনাগোনা,
তোর্ষার বুকে ছায়া পড়ে।

আকাশের নিরুদ্বেগ সীমানায়, চিলেরা
ডানা মেলে ভেসে যায়।

অসময়ে নাগেশ্বরীর গন্ধ ভেসে আসে।
তবু ভাবি,
এত বাধা, এত উত্তাল ঢেউ পেরিয়ে,
বালির বুকে, পায়ের চিহ্ণ এঁকে এঁকে
কি করে যাই!

ক্লান্ত দেহে বিভ্রান্ত পদক্ষেপ।
চারিদিকে অন্ধকার।
ঝাউবনে ঝড়ের মাতামাতি।

স্খলিত পায়ের চাপে,
বালির বুকে মুহূর্তে
ওঠে আর্তনাদ
হারিয়ে যাওয়ার।

তবুও এত পথ মাড়িয়ে,
নাগেশ্বরীর গন্ধ বুকে নিয়ে,
বালির বুকে পায়ের চিহ্ন
এঁকে এঁকে,
তোর্ষা—বার বার আমি
তোমার বুকে হারিয়ে যেতে চাই॥

সময় আসন্ন

বন্ধু সময় আসন্ন
ঝড়ের সংকেত প্রকৃতির
আকাশে বাতাসে
এবার কবরের মুখ খুলে
দ্বিতীয় আগুনে—মশাল জ্বেলে
এসো, একসঙ্গে লৌহকপাটের
সামনে গিয়ে দাঁড়াই।
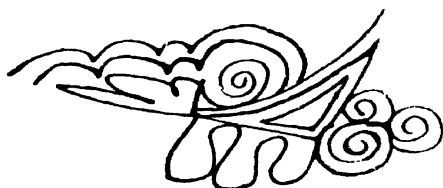
আনন্দ উৎসব

অস্তমিত সূর্যের প্রায়ান্ধকার আলোকে
ধ্যানগম্ভীর হিমালয়ের
পাদদেশে কলতানে মুখরিত তোর্ষা
তটরেখার-প্রান্তিক ছুঁয়ে ছুঁয়ে
উচ্ছ্বসিত আবেগে
    আকর্ষিত সাগরের বুকে
        আত্মসমর্পিত
        সমাহিত।

বালুচর ঘিরে
নিশি পাওয়া মেঘের কবরীর বুকে নিশ্চিন্তে
ভেসে যায়,
সজনে গাছের ফাঁকে ধুতরা ফুলের মিষ্টি
গন্ধ গায়ে মেখে
সুপরি বনের
মাথার উপর লক্ষ লক্ষ
    জোনাকিরা জ্বলছে
মনেহয়
অকস্মাৎ স্বাতী অরুন্ধতী
সপ্তর্ষি মণ্ডলের আবির্ভাবে
আকাশ ঘিরে
উজ্জ্বল নক্ষত্রের আনন্দ উৎসব।

কঠিন পৃথিবীর বুকে

শব্দের ঢেউ গুনে গুনে,
পাহাড় নদী—গ্রাম পেরিয়ে,
একটি শব্দের প্রান্তে
নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালাম।

শব্দের ধ্বনি গুনে গুনে,
অনেক ধ্বনির তরঙ্গ এড়িয়ে,
একটি প্রতিধ্বনির বুকে
ধ্বনি হ'য়ে জ্বলে উঠলাম।

অন্ধকার পথে হাঁটতে হাঁটতে,
পথ হারাবার ভয়ে, কত
অজানা অন্ধকার পথ এড়িয়ে
নিরাপদ পথে এসে দাঁড়ালাম।

জীবনের নিরাপত্তার খোঁজে,
দেশ থেকে দেশান্তরে, নির্বান্ধব ঘুরে ঘুরে,
সীমাহীন আকাশের নীচে,
নিঃসঙ্কোচে দাঁড়ালাম।

কঠিন পৃথিবীর বুকে
ভালবাসার পাপ্‌ড়ি মেলে
জীবন্ত হ'য়ে জ্বলে উঠলাম।

মৃত্যু মিছিল

(১৯৭৪-কুচবিহারের দুর্ভিক্ষকে মনে রেখে)

আহা বন্ধু কি সুন্দর !
সমুদ্রের জোয়ারের আবর্তে
তটরেখার প্রান্ত ঘিরে
রাত্রি অন্ধকারে হায়নার চোখ জ্বলে

এখানে—
প্রস্ফুটিত গোলাপের পাপড়িগুলো
ঝরে পড়ে ;
মাটির বুকে—শিশির সিক্ত দুর্বাঘাসে
হাহাকার ক'রে, ঘুমিয়ে পড়ে—
আহা এইতো আমাদের পৃথিবী
এ পৃথিবীতে জন্মেই
আমরা কবরের দিকে পা বাড়াই।

মৃত্যুর অতলান্ত স্বপ্ন ঘিরে
নিরুদ্দেশ যাত্রা পথে,
গোলাপের গন্ধে, নবান্নের স্বপ্নে,
ক্ষুধার্ত মানুষগুলো
এমনি করে ঝরে যায়।

শোষকের অশ্বমেধ যজ্ঞে
অবাঞ্ছিতের আত্মাহুতি ;—সগৌরবে
ক্ষমতার দম্ভকে,
বার বার করেছে—সুপ্রতিষ্ঠিত।

আহা বন্ধু
এ পৃথিবী কত সুন্দর !
অভিশপ্ত জন্মের, বঞ্চিত অধিকার ঘিরে
সোনালি ধানের ক্ষেতে, তাইতো বঞ্চনার
আগুন জ্বলে।

শোষণের ষড়যন্ত্রে, ক্ষমতার দম্ভে
বঞ্চনার বিষে, অসহায় মানুষের
জীবন ঘিরে
    করে আর্তনাদ।
এখানে মৃত্যু মিছিলে,
প্রত্যাশিত সূর্যরশ্মি
    কফিনের আড়ালে
        বার বার হারিয়ে যায়।

ওরা ঘুমায়।
নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকে কফিনের বুকে।

এ পৃথিবীতে প্রতিদিন,
মায়ের শুষ্ক স্তনে মুখ রেখে,
কত অসহায় শিশু, অনাদরে অবহেলায়
পাপ বিদ্ধ ক্রুশ
    পিঠে বয়ে নিয়ে বেড়ায়।

পরেশ সোম (১৯৩২)

রাজা

মধ্যরাতে তুমি ফিরছো রাজা-রাজা ভাব নিয়ে
তোমার পায়ের নিচের মাটি সরে সরে যাচ্ছে
তোমার দুই চোখে প্রস্তরযুগের বর্ণলিপি
রাস্তার কুকুরগুলো বেয়াদব
কুর্ণিশ না করে জানাচ্ছে অস্বীকৃতি উচ্চস্বরে।

পথের সঙ্গে তোমার যুদ্ধ, তুমি ফিরছো
যুদ্ধের পর যুদ্ধে তুমি ক্লান্ত বিরক্ত
তোমার পরিচ্ছদ এখন বিচিত্র রঙে রঞ্জিত
একটি জোনাকি তোমার ঘাড়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি নিয়ে :

অবশেষে তুমি নিজস্ব মহলে
পা সটান করে লাথি মারছো ঘরের দরজায়
শ্বশুরের চার পা বানিয়ে সম্বোধন করছো
তার কন্যাকে
ভয় দেখাচ্ছো কোতলের
তুমি রাজা এখন এই মুহূর্তে…

চিতারা রয়েছে

নিষিদ্ধ পথ ধরে কখনো হেঁটো না চিতারা রয়েছে
মুগ্ধ হবে যাদু দেখে, তৃষ্ণা পাবে
নিঃশ্বাসে ঝরে যাবে যদি জোৎস্না থাকে
হয়তো হারিয়ে যাবে শুদ্ধ কমণ্ডলু।

চিতারা হয়েছে চিতা, তাই নির্মম
ভেঙ্গে ফ্যালে মূল্যবোধ, শঙ্খের হৃদয়;
ছিঁড়ে ফ্যালে গৃহজাত ছায়ার মাদুলী।
ভালবাসা বাসাহীন, অতৃপ্তি নিয়ে
ফিরে যায় ঘরে ঘরে বিশ্বামিত্র মুনি।

চিতারা রয়েছে পথে, ওপথে যেও না
মুগ্ধ হবে যাদু দেখে, আহা মরি যাদু
মুহূর্তে হতে পারে সাপের কুণ্ডলী।

শ্যামল চৌধুরী (১৯৩৪)

সেই অন্ধকার আলোর প্রপাত

কারা যেন বলেছিল—আলো নয় একমাত্র মাতাল সময়
মাঝে মাঝে কী যে সব ইচ্ছে হয় কেবলি ইচ্ছে হয়
গোপনে গোপনে এক নদী হওয়া যায়—
সাগর স্বপ্ন ভরা চোখের তারায়
জ্বলে জ্বলে গ'লে গ'লে সব আলো মুছে দিলে
কত রোদ দেখা যায় মনের ভিতরে—

আলোক আড়াল করা এই সব কল্লোলিত স্রোতে
শুধু এক নির্জনতা বৃষ্টি হয়ে নুয়ে নুয়ে
সব ছায়া যায় ছুঁয়ে—ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় ভেসে
অমল অস্তিত্ব মাখা শৈশবের মেঘে

কারা যেন আজো বলে সেই মেঘ চিরায়তী
নিতল চোখের মত স্মৃতি আর ছায়াদের মাঝে
কী গোপন মমতার দুর্বলতায়
আঁধারে ঘনিষ্ট হয়ে পূর্ণতার প্রত্যয় ছড়ায়।

প্রিয় বর্ণমালা

কেবল বাতাস জানে
নিষেধের বেড়াজালে
কোথাও ফোকর থেকে যায়
লক্ষ্মী মেয়েটি জানে
সবাই ঘুমিয়ে গেলে
নদীকে দূরের টানে সরে যেতে হয়।

খবর

আমি যে তার অনেক খবরই জানি
সেই নদীটির নাম একটি নদী
সেই ফুলটির নাম একটি ফুল
সেই মানুষের সংজ্ঞা একটি মুখ,

আমি যে তার অন্য খবরও জানি
সকাল থেকেই সাঁঝের অনুগামী
শীতল বাতাসে আগুনের আলপনা

আরশীটার পেছন থেকে কখন যেন ঝরে গেছে পারা।

জীবনের জন্য

আরণ্য হাতিরা আজ সভ্যতার স্বাদ পেয়ে গেছে
সাবলীল প্রত্যয়ে কৌতুকে নেমে আসে
পরিচিত অরণ্যের ঘেরাটোপ ছেড়ে

হাতিরা এখন যেন জেনে গেছে স্থির
অমলা রূপসী এই মাটির শরীর
ঘিরে মাংসাশী প্রাণীদের বড় বেশী ভীড় ;

আরণ্য আলোর বানে দামাল হাতিরা কালোরাতে
প্রাচীর গুঁড়িয়ে দিয়ে সবুজ সোনায় খেলা করে।

দীপ্তিময় সরকার (১৯৩৫)

দূরে বহু দূরে

সবাই চলে যায় যে যার পথ ধরে দূরে বহু দূরে
শুধু পড়ে থাকে স্মৃতির পাতারা গন্ধে ভরে থাকে
নিঃসঙ্গ পূর্বাভাস। প্রবলতর বর্ষণের শেষে
পড়ে থাকে শুধু স্নিগ্ধ গর্ভবতী আকাশ। কিছুক্ষণ আগে
একমুখ উচ্ছলতায় অরণ্যের শূন্য অন্ধকারে
অবিরাম শরীরের শব্দের উদ্দাম ঢেউয়ের খেলা
মুছে শেষ হয়ে যায়, শুধু পড়ে থাকে নির্জন ঘ্রাণ
অথচ সবাই চলে যায় যে যার পথ ধরে দূরে বহু দূরে
এভাবেই শতাব্দীর খেলা চলে, জীবন ভোর
শুধু অনুভূতিগুলো ছড়ান ছিটান পড়ে থাকে ইতস্ততঃ ধুলোয়

অনন্ত দূরে

সে চলে গেছে দূরে অনন্ত দূরে
শব্দের অহংকার হারিয়ে গেছে নদীর শরীরে
স্মৃতি গন্ধখেলা রক্তের ভিতর মাঝে মাঝে
উঁকিঝুঁকি মারে, এমনি করেই বর্ণহীন গন্ধ
কিছু স্মৃতি, কিছু ভালবাসা ঘুরে ঘুরে
আমাদের চারপাশে শীর্ণ ছায়ার মত খেলা করে
এভাবেই আস্তে আস্তে বুকের ভিতর থেকে
হারিয়ে যায় চেনা অচেনার সমস্ত কলরব
ফুলের বাগানে ঝরে পড়ে স্মৃতির বৃষ্টি উৎসব
সব শব্দ খেলা ফেলে রেখে চলে যায় চিরকালের পথে
সে চলে গেছে দূরে অনন্ত দূরে।

একাকী ভুবন

একদিন নিঃশব্দে ভয়ংকর বৃষ্টিপাতে ডুবে গিয়েছিল
সমস্ত কোলাহল, বুঝি এভাবেই সমস্ত উৎসব রাত্রি
বুকের ভিতর থেকে হারিয়ে যায়। এভাবেই
রোদের ভিতর টলতে টলতে ছায়াও নিঃশব্দে বদলে যায়।
গ্রাম্যপথে যে শিশুটি একদিন চলতে শিখেছিল
মন্দিরের পথে, বর্ণমালাগুলি নীল জ্যোৎস্নায়
প্রস্ফুটিত হয়, অস্তিত্বের ধ্বনি বৃষ্টির মত
রক্তের ভিতরে খেলা করে, এইভাবেই একদিন
নিঃশব্দ আর্তনাদে ভেসে যায় আত্মীয়-স্বজন
পৃথিবীর আশ্চর্য নিয়মে সবকিছু নির্বাসিত হয়
শুধু খেলা করে নিয়মিত একাকী অন্ধকার ভুবন।

শেষ ট্রেন চলে গেলে

শেষ ট্রেনটা চলে গেলে বিস্ময়ের ঘোর আজীবন
হৃদয় জুড়ে ঘন অন্ধকার। এখনও মাঝে মাঝে দিগন্ত
জুড়ে খেলা করে বৃত্তাকারে স্বপ্নস্মৃতি। শৈশবে
অবাক হওয়া বর্ণপরিচয়, বিছানায় শুয়ে শুয়ে
ময়না পাখির মত ছুটে যাওয়া অবাক বিস্ময়।
অপুর স্বপ্ন দেখা শূন্য অন্ধকারে ব্যাকুল প্রতীক্ষায়
একবুক আনন্দ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি বিকেলের পড়ন্ত বেলায়
কখন অর্ধস্ফুট সূর্যের মত দূরে বহু দূরে
ট্রেনের অদ্ভুত কুয়াশার পর্দা সরিয়ে লাল সূর্যের
অস্ফুট রেখা, হঠাৎ পূর্ণিমা চাঁদের মত গর্ভবতী
এখনও মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে থাকি স্টেশনের পাশে।

সমীর চক্রবর্তী (১৯৩৭)

হলুদ ঘাসের অমনিবাসে

বুক ঠুকেই সে ব'ল্‌তো :
ছাখ্‌না কেমন
ফুসফুসটাকে ফাটিয়ে হাসি—

সে কেবল তোর জন্যে
তোর জন্য কেবল সর্বনাশী !
সুঠাম গড়ন
নিশীথরাতে গণ-জ্যোৎস্নায় বিদ্ধকরণ
দেবদারু-বনে, ভালো যে বাসি ।

বুক ঠুকেই সে ব'লতো—
কেননা শুয়ে সে আছে
খোলা বুকে ঐ হলুদ ঘাসের মাঠের কাছে
কাঠবেড়ালীরা ফুসফুস তার
খুলে নিয়ে গিয়ে
ঝুলিয়ে রেখেছে জারুল গাছে ।

এক হাঁটু জল ভেঙ্গে

এক হাঁটু জল ভেঙ্গে
এসেছিলে আমার উঠোনে
উঠোনের ছাত নেই জেনে
ব'সে জিরোবার জন্যে
বেদীও ছিলো না

সুচতুর সাপ, প্যাঁচা
ও অন্যান্য নিদ্রিত পাখি ছিল
অতসীলতায় ফুল ছিল
পিচ্ছিল চত্বরে
বর্ষা ও বিদ্যুত ঝুমকো ফুল
চোখ ঝল্‌সে দিয়েছিল
আহত হবার আগে শেষবার।

চিতার চোখের মধ্যে

নিছক প্রেমের জন্যে অপরাধ করা যায়
প্রেমের কারণে
পদাতিক হারে, জেতে

প্রেমের জন্যে তারা শেষবার
জল খেতে গিয়েছিল নদীর ওপারে

দু'জনে গিয়েছিল
সন্তর্পণে পাখিকে পড়াতে
অন্ধকারে

প্রেমের জন্য তারা শেষবার
আচমকা দেখেছিল
চিতার চোখের মধ্যে গুঁড়িমেরে
দুরন্ত রায়ডাক।

তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৯)

স্বপ্নের জাহাজ সমুদ্র পাড়ি দেয়

সামান্য কুয়াশায় ভারি হয়ে ওঠে নিষ্ফল অভিমান
মধ্যরাত্রে স্বপ্নের জাহাজ প্রতিদিন সমুদ্র পাড়ি দেয় ;
জাহাজডুবির গল্প মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে লোকালয়ে
ভ্রমণবিলাসী মানুষও ফিরে আসে ঘরোয়া অভ্যাসে
পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে দীর্ঘদিন ধরে জন্মে প্রাচীন ক্ষোভ
ভূমিকম্প হলে আন্দোলিত বৃক্ষশির মাথা-উঁচু ঘর-বাড়ি—
অবলীলায় ভেঙ্গে ভেঙে পড়ে দেউরির ইঁট, বালি এবং পাথর
এই ভাঙ্গাচোরা দৃশ্যে চোখে পড়ে না নারী ও আগুন
দলা-পাকানো স্মৃতি চেয়ে দেখে আতঙ্কিত আঁধার
অসহায়তায় ক্ষয়-ক্ষতির কথা গৃহস্থের মনে আসে না
মাটিকে ছুঁয়ে সময় ঘটনার নীরব সাক্ষী থেকে যায়
ভাঙ্গা-গড়ায় জড়িয়ে আছে প্রকৃতির আজীবন বিধান
প্রজন্মের কাছে মাথা নীচু করে থাকে সম্ভাবিত দিন।

এই ভোরে

কাকভোরে তুমি প্রতিদিন মুখ দেখ জাদুকরী মনের আয়নায়
যতোটুকু আলো প্রয়োজন, ততটুকু এসে পড়ে মুখের ছায়ায়,
রেখাগুলি চিনে নাও, দেখে নাও কতোখানি ক্ষয়ক্ষতি ছিল গত রাতে
দুঃস্বপ্নেরা ভেসে গেছে ঘুমে কাদা ঘোলাজল বুকের প্রপাতে।

বিপথ গামিনীমন গ্লানিমোচনের সুখে সদাচার সুচারু ভাষণ
বিপন্ন বিশ্বাস ছুঁয়ে এই ভোরে অভাগার কে বলো আপন ?

সামচির ভুটানি মেয়ে

সামচির ভুটানি মেয়ে গয়েরকাটার হাটে এনেছিল
সোনালী আপেল ঃ
রূপবতী লাল টমাটোর সাথে ছিল মারুয়ার মদ
আহ্লাদী হাওয়ায় তার খুলে গেছে বুকের আঁচল ··
ঢিলেঢালা গায়ের কামিজ
দেহাতি রৌদ্রের আঁচে ভিজে ওঠে পাথুরে শরীর
লক্ষ্যহীন স্বপ্ন নিয়ে উতরোল গঞ্জে এসেছিল
ভেবেছিল দূরে সমতলে নেচে উঠবে জীবনের বিচিত্র উৎসব।

হাট ভেঙ্গে গেলে মারুয়ার খর-গন্ধে কেউ কেউ
ভাঙা দোচালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছিল
ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে হাট জুড়ে সোনালী আপেল
টমাটোর লাল ক্ষেতে বুঁদ হয়ে শুয়ে আছে আখুটে বিড়াল···

প্রতি হপ্তায় ফিরে যাওয়া হাটবাবু সেই রাত্রে বাসে চেপে
ফেরেনি শহরে।

খরা

আকাশে দাক্ষিণ্য ছিল সমস্ত ভুবন জুড়ে শস্যহীন খরা—
নির্জলা স্বপ্নেরা কাঁপে দুপুরের রোদে, শাখা প্রশাখায় দেখ
অজন্মার ফুল, বিহ্বল কণ্ঠের পাখি দূরে থেকেছে উন্মনা
ঘরে উপবাসী দিন দানা মুখে নিয়ে হাঁটে প্রাজ্ঞ পিপীলিকা
পালিত পশুর চোখে ভীতির প্রবাহ নামে হা হা আকুলতা
ছিন্ন মেঘ উড়ে যায় শব্দহীন গৃহস্থালী ঢেকেছে ছায়ায় ;
ভিক্ষার অভাব দেখে দুঃসময় টের পায় আজন্ম ভিক্ষুক।

অরণ্যের কবিতা

অরণ্য বাংলোয় বসে তুমি অনিমেষ চেয়ে দেখছো দূরান্তের সবুজ সমুদ্র···
জ্যোৎস্না-প্লাবিত স্বর্গীয় উপত্যকা এমন মাতাল মুগ্ধ করেনা তোমাকে—
তোমার নাগর রসিক মন, যাযাবরী দু'চোখ, দৃশান্তরে থেকেছে নিস্পৃহ
তুমি দেখছো জাম ও জারুল, শাল-পিয়ালের সারি ঘাস ফড়িং এর ভীড়
নামহীন, গোত্রহীন, সরল বর্গীয় কিছু গাছ, বন্যফুল খয়েরের শান্ত পটভূমি
গভীর ঘুমের থেকে উঠে আসা পশুদের হাইতোলা ঢিলেঢালা
বেপথু শরীর—
সোনালী শিশির যেন ধুয়ে দিচ্ছে গা, সকালের সুকোমল ঘাসের জাজিম
কে যেন রেখেছে পেতে অভ্যর্থনা জানাবার প্রকৃতিতে হৃদয়ের
চারু আয়োজন ;
মেঘের ডিঙ্গিতে চড়ে সূর্যদেব এনে দেন নীল জরি, কল্পনার বাহারি মুকুট
উড়ন্ত বকের সারি ভূটান পাহার ছুঁয়ে ভেসে যায় জয়ন্তীর গ্রানাইট ছায়ায়
কমলা বাগান থেকে নেমে আসে ঝুড়ি কাঁধে গায়ে-ঢলা কলহাসিতার দল
অনভ্যস্ত দু'চোখ মেলে চেয়ে দেখছো ছলা-কলা বেপরোয়া আরণ্যক দিন।

এসব পুরনো ছবি, বনপাল বলে দেন গতিবিধি কিছু অলিখিত
নিয়ম-কানুন—
গাইডের কাছ থেকে শোনা যায় জংলী জীবন, পশুদের ভয়ঙ্কর সম্ভোগ
বিলাস
সরস গল্পের ঘাস দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে ছিঁড়তে নেপালী চাকর উদভ্রান্ত হঠাৎ
আঁধারের ছায়া তার বদলে দেয় মুখ পাথুরে কয়লার মতো অদ্ভুত কঠিন
রাত্রির শরীরী মূর্তি সন্ধানী চোখ মেলে হাঁটে সারারাত, সতর্ক সংলাপ
গাছের পাতায় ঝরে ফিস্‌ফিস্, ঝিন্‌ঝিন্ উত্তেজনা হন্তারক অধৈর্য কুঠার
ছিঁড়ে খুঁড়ে নিয়ে যায় বেবুশ্য বন্দরে, পড়ে থাকে তিক্ত কষ, ধর্ষিত প্রকৃতি
প্রভাতী কুশল বার্তা নিয়ে এলে চৌকিদার রেখে যায় অফুরান
স্পন্দিত কাহিনী
সহসা চোখের সামনে ভেসে ওঠে কাঠের ফলকে লেখা জ্বলজ্বলে অভয়
অরণ্য।

নষ্ট হয় সাজানো বাগান

সন্দেহের বিষ বড়ো ভয়ানক নষ্ট হয় সাজানো বাগান···
নিজেকে উৎসর্গ করলে দানপত্রে সমবেত সবাই মোহিত
সরলরেখার মতো স্বচ্ছতর সংসারের ভিতর-বাহির
কথার উঠোনে ধায় বসে থাকে উচ্চারিত বিশ্বাস নিবিড়
অনুগত প্রতিবেশী দুইহাতে তুলে দেয় নিজস্ব নির্ভয়···
সটান অন্দরে গেলে কানাঘুষো সম্ভবত কেউ-ই করেনা।

বিশদ জানার পর কেউ কেউ তুলে রাখে সুখের কুসুম···
মলিন ছায়ার মতো বেপাড়ায় হেঁটে যায় নিষিদ্ধ প্রেমিক
আনাচে কানাচে ভয় ওৎ পেতে বসে থাকে রোমশ উত্তাপ
অক্ষমতা ঘিরে রাখে দয়িতার আরক্তিম আবেশী দোলায়!

প্রণয়ে বেদনা বাজে সংগোপনে ফুটে ওঠে ঈপ্সিত গোলাপ
না পাওয়ার অভিমানে নুয়ে পড়ে মালীহীন সাজানো বাগান।

দুঃখ যে প্রবাসে গেছে

দুঃখ যে প্রবাসে গেছে সঙ্গীহীন ম্লান স্মৃতি গৃহকোণে অসুখে একাকী
সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বেলে বসে থাকা রোমন্থনে উদাসীনী প্রোষিতভর্তৃকা
আনত চোখের জলে বৃক্ষ-বনরাজি ভেজে দেহজুড়ে শীতের কুয়াসা
বাগানে ফুটেছে ফুল রঙ সাজানোর খেলা নিসর্গের এইতো ভূমিকা
পাথিব পথের শুভ মনে মনে ভাবা রোজ গৃহস্থের পাথিব কল্যাণ
এইতো জীবন দেখ চলমান প্রবাহের নিত্যধারা নিশিদিন ব্যাপী
বিন্যস্ত ভ্রমণ শেষে পরিপূর্ণ মন নিয়ে পুণ্যলগ্নে ঘরে ফিরে আসা
ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে থাকা গল্পগুলি থেকে যায় প্রবাসের পথের দু'পাশে
মোহিনী সুখেতো ছিল ঘরভরে হেসে দুলে সম্ভোগের উজ্জ্বল মৌতাতে
অথচ বলেনি মুখে মোছো নির্জনতা ছায়া চেয়ে ছাখো আলোক পুরুষ

অরুণেশ ঘোষ (১৯৪২)

নিষিদ্ধ যাত্রার শেষে

এই যে কুটির পাতা ছাওয়া, গৃহ কোণে
পরিত্যক্ত ধূসর বল্কল, ঘর থেকে নিকানো
উঠোনে দুজোড়া পা'য়ের ছাপ, দূরে নদী
অন্য দিকে নিকষ অরণ্যে মেঘ ও বাতাস
ঘরে কেউ নেই?

সকালের আলো এসে

একটি শিশুর মুখ ছাখে, ঘুম থেকে
জেগে সেও আলোর ফুলকি নিয়ে মেতে উঠতে চায়,
হাসে···ঘৃণার সমুদ্রে শুয়ে
হে অগস্ত্য উত্তরের শহরে শহরে একা
অতিক্রম করে এসে

স্নান ও আহ্নিক, সূর্যস্তব

আর নক্ষত্র বন্দনা, নক্ষত্রের মধ্যে এসে
রাত্রি-ভর গেয়ে যাওয়া একই পুরনো গান
তবু কোন অলৌকিক সুর নেমে আসে নীচে
দুঃস্বপ্নের জাল ছিঁড়ে ঝুঁকে পড়া কালো
দুঃস্থ মুখ, পাত্রে পাত্রে বিষ ও আগুন
সেই নিভাঁজ বিছানা জুড়ে···

হা খোলা শরীর নিয়ে

ধোঁয়া, হাস্য, কলরব থেকে ঊর্ধ্বে এসে

কে আকাশে তাকায়? সরষের-হলুদ-
ফুলে-ভরা-মাঠ ধরে ফিরে আসা নদী-
থেকে নগ্নবুক, আর কোন ফিরে যাওয়া
নেই জেনে, ঘরে কে ঘুমিয়ে থাকে
ঘর ছাড়া··· ?

নিষিদ্ধ এলাকার বস্তি
ঝাঁপ খোলা এক চালা, মধ্যরাতে ঘুরে ঘুরে
যায় লম্ফ—আর কোন মুখ খোঁজে পিতৃপরিচয়হীন?
যার পাশে স্তব্ধ উত্তেজনা, মদ ও চাটের গন্ধ
অচেনা নিঃশ্বাস, বুক জুড়ে যে শূন্যতা ঘাম ও সন্ত্রাস
এ কোন মেয়ের ঘরে বুক ভরা ভয় নিয়ে চোখ মেলে
চেয়ে থাকে পারাপারহীন অন্ধকারে পাশ ফেরে
ঘাসের মসৃণ মাংস খুঁজে পায় হাত, খুঁজে পেয়ে
শুকনো জিবে চেটে নেয় ঠোঁট···

এই সে কুটির

এই সে কুটির, পাতা-ছাওয়া
উৎস থেকে প্রস্রবণ, পর্বত পেরিয়ে এসেছে সেই
মেঘ ও বাতাস, পাখি এসে দেখে যায় দূর সেই
দেশ থেকে বছরে বছরে, লেবু ঝোপ থেকে
উড়ে এসে বসে জানালায়, ছাখে তীক্ষ্ন চোখে
কি আছে এখানে ? ঃ—নগ্নতা ও গান, খোলা মাঠ
খড়ের বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে দরোজা খোলা
স্বচ্ছ আকাশ, হেঁটে যাওয়া নদী ও অরণ্য দুই
দিকে ··।

হাস্নুহেনা

খুব কাছে আছি, এই যে নিশীথের ডাক শুনে
নিশীথ ফেরারী ফিরে আসে এত কাছে, পাশাপাশি
একইতো শয্যায় শুয়ে থাকা, একই আচ্ছাদনে
দুই পাশে দুই নগ্ন দেহ, মাঝামাঝি তোরই রাখা
দীর্ঘ তরবারি—ঠাণ্ডা ও ধারালো, দুজনেরই জেগে থাকা
শুধু মৃদুগন্ধ তোর ক্রমে সন্ধ্যা-রাত্রি থেকে ভোর
সারারাত শরীরের কোষে কোষে উন্মাদনা, হা হা রব
যে নক্ষত্র ভুলে যেতে চায়—চলে যায় দূর থেকে দূরে
তবু তাকে খুঁজে পেতে নিয়ে আসা চাই, এ কোন
রহস্য তোর, প্রহেলিকা, বল আর কোন দুয়ারে
দাঁড়িয়ে, তুই ডেকে তুলবি ঘুম চোখ ভগ্নার্ত কিশোর ?

অতৃপ্ত দেবতা

যে উৎসব নক্ষত্র শিয়রে রেখে মধ্যরাতে এ প্রান্তরে
এই মাঠে, এই যে মাঠের শেষে গ্রাম, আসঙ্গ-উন্মুখ নদী

যে উৎসব নক্ষত্র শিয়রে রেখে শুরু হবে জেনে
অপেক্ষায় থাকা, উপজাতি রমণীরা কান পেতে শোনে

শুনে নিয়ে ঘুমন্ত ডানায় ভর দিয়ে স্বপ্ন থেকে, সন্তানের
পাশ থেকে, স্তনের ওপর থেকে আড়াআড়ি পুরুষের হাত

সরিয়ে নিয়েছে, নিঃশব্দে দরোজা খুলে পথে পথে ফেলে আসা
নিঃশেষে ছড়িয়ে আসা পথে পথে যে সংগীত, ভালবাসা

উপজাতি গ্রাম থেকে বয়ে আনা গান, এ কোন উৎসবে
বৃত্তাকারে জেগে ওঠে ঢেউ, হাতে হাত ধরে ঘুরে ঘুরে

নেচে ওঠা হা-খোলা শরীরে যে সংকেত রাত্রির বাতাসে
বার বার, যে সংকেতে স্তনের আস্বাদ থেকে ছিঁড়ে নেওয়া

ঘুমের শিশুর জিভ—দেবতার মত মুখ নিয়ে নির্বিকার হেসে
দেবতার মত মুখ তবু হাঁটু গেড়ে বসে দুদিকে ছড়িয়ে

দুহাত এ রাত্রির পতিত প্রান্তরে ভোরও অপেক্ষায়, অপেক্ষায়
বুক পেতে বসে থাকা, কি চাস্ শরীর থেকে শরীরের কাছে···?

যে উৎসব নক্ষত্র শিয়রে রেখে শুরু হয়ে শেষ হয়
ভোরের আকাশে, দেখি আমাকেই ঘিরে পড়ে আছে, উষ্ণ রক্ত

ফুল, আমাকেই ঘিরে জ্বলন্ত মশালগুলি—দূর দূর ঘর থেকে
বয়ে নিয়ে আসা, জ্বলে জ্বলে, নিভে গিয়ে মুখ গুঁজে পড়ে আছে

এলিজি—১

আমি অপেক্ষা করি, আমি দাঁড়াই নদীর শুকিয়ে যাওয়ার পাশে
যেখান থেকে জলের একটি রেখা আসে, যেখানে বাঁক নিয়েছে নদী
বাঁকের কাছেই, নদীর পিঠের উপর একটা ঝোপ, যে ঝোপের মধ্যে
তোর কবর
এই সেই ঘাস ও শিশু গাছের ঝোপ, এইখানে তোর মা আসতে
চায় একদিন
শূন্য ও মরা নদীর দিকে ঝাপসা ও কোঁচকানো চোখে তাকায়
হয়ত বা তখন হু হু বাতাস
'আমাকে চিনিয়ে দাও' সে বলে, 'আমি যাবো,' মুখ ফিরিয়ে
নিতে হয় আমাকে
আমার চোখ জ্বলে উঠে অথবা জ্বালা করে মানুষের চোখের
মতন আমার চোখ মাটির দিকে তাকায়
আমি অপেক্ষা করি, এই সন্ধ্যে বেলা হাওয়া আমাকে ছুঁয়ে যায়,
আর একটি
সবুজ ও ছেঁড়া পাতা এসে থেমে পড়ে নিরেট শরীরের কাছে,
ঘুমোবার আগে
ঘাড় তুলে আমাকে দেখে নেয় একটি ঘাস ফড়িং ছোট্ট একটি
পাখি বেরিয়ে আসে
• লাফিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে আসে ঝোপের ভেতর থেকে যেখানে
কয়েক চাপড়া মাটির নীচে তুই

যার জন্য এই জন্ম নেওয়া তোর, যার জন্য আমাদের এই হাস্যময়
দুঃখ জন্ম দেওয়া
যার জন্য মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে বসেছে মানুষ কিংবা পায়ের উপর
পা, নগ্ন, আবিষ্কার ক'রে
পাশ ফিরেছে এক উষ্ণতায় দুঃসময় সুদীর্ঘ নিশ্বাসে, আর
আলোজ্বালা হয়েছে তখন
আর মাছের পেটির মতন দেহ ঝলসে উঠে ভেসে গেছে, স্তন,
স্তন হয়ে ফুটে উঠেছিল লণ্ঠনের নীচে
তারও আগে ওই সে বালক একা ফিরে এল এক সন্ধ্যাবেলা
রেললাইন ধরে ধরে হাতে বই শুকনো মুখে
তবুও দাঁড়াতে হয়েছে তাকে কাঠের টেবিলের পাশে, ঘরে
অন্ধকারে, টেবিলের ঠাণ্ডা পিঠের উপর দীর্ঘ হাত রেখে
সিগারেট-সুদ্ধ একটি মুখ আর নীচে সম্পূর্ণ নগ্ন একটি নারী শুয়ে থাকে
স্বাভাবিক শব্দ উঠে আসে
কলধ্বনিময় শব্দ উঠে আসে আর যার ভেতর থেকে হামা দিয়ে
বেরিয়ে আসতে আসতে তুই, আমাদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে
আমাদের যুক্তকরে উত্তপ্ত ও উত্তেজিত ক'রে, ভেঙ্গে ও ছড়িয়ে দিয়ে,
আমাদের ভিন্ন ভিন্ন স্বপ্ন থেকে উঠে আসে
যার জন্য, সে এসেছে ধীর ও মন্থর পায়ে যদিও লজ্জিত খানিক
একারণে একটি সবুজ পাতা ক্রমশ
ক্রমশ বাদামী ও খয়েরী সে হতে দিয়েছিল, তারই অভিমুখি
একটি গান সে গীত হতে দিয়েছিল বলে, জেনে
কিছুটা অস্বস্তি হয় তার এই ক্রন্দনের রোলে, তবুও নিষ্ঠুর ভাবে
ফুঠে ওঠে মুখের প্রতিটি রেখা এবং শরীর

ছোট শহরের গান

আমরা গাই, এই নষ্ট শহর
শুনতে পায় না সেই গান
আমরা বয়ে এনেছি আমাদের
ফল, এই যে ছাখো গড়ে তোলা
আমাদের কমলালেবুর বাগান
আমরা দেখাই, এই নষ্ট শহর
দেখতে পায় না, সেই প্রাণ
যা সবুজ ফলকে ক্রমশ
করে তুলছে হলুদ, আমরা গাই
থিকথিকে ভীড়ে, নর্দমায় আর
ভাটিখানায়, শেষ মাতালটাকে
বিদেয় দেওয়ার পর আমরা অন্ধকারে
আনাচে কানাচে খুঁজে বেড়াই
শূন্য বোতল আর গুণ গুণ করে গাই—

আমরা গাই, এই নষ্ট শহর
শুনতে চায় না সেই গান
আমরা বয়ে এনেছি আমাদের
ফল, এই নষ্ট শহর কেঁপে ওঠে ভয়ে
ভয়ে ঘুমিয়ে পড়তে চায় মুখ ঢেকে
হেসে উঠি আর গেয়ে উঠি আরো জোরে
যদিও কোনও নালিশ নয় আর
কোনও দুঃখ—কোনই আক্ষেপ নয় আর
শুধুই গোপন পর্বতে, খাঁজে খাঁজে
এসো গড়ে তুলি, যা গড়ে তোলার।

সমীর চট্টোপাধ্যায় (১৯৪২)

যেতে পারি নিরুদ্দেশ যাত্রায়

এখন প্রাচীন দুঃখবোধগুলো দূর্বাঘাসের স্নেহ দিয়ে
জড়িয়ে রেখেছি
অশোক ফুলের মতো লাল হয় হৃদ্‌পিণ্ড
জ্যোৎস্নার চাঁদ খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়
অমাবস্যার রাত্রি ঢেকে রাখে দুটো চোখ
এইভাবে সমস্ত মূল্যবোধ, হিসেব নিকেশ
রাতভোর নিজেদের ঘরে।

প্রতিদিন অহেতুক ম্রিয়মান বসন্তের বিকেল
আয়নায় সাপের খেলা
ঈগল ক্র্যাগ থেকে ঝাঁপ দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার
তুষারের ঘ্রাণ নিতে চাই
সহজেই দুরন্ত নদীতে গা ভাসিয়ে দিয়ে
যেতে পারি নিরুদ্দেশে যাত্রায়

হঠাৎ আঁতুড় ঘরে কোন নবজাতকের তীক্ষ্ণ চীৎকার
আমাকে সচকিত করে তোলে
অশোক ফুলের মতো লাল হয় হৃদ্‌পিণ্ড
অমাবস্যার রাত্রি ঢেকে রাখে দুটো চোখ
নিজেকেই হত্যা করি কোন স্বপ্নময় রাতের গভীরে

যদি চলে যেতে হয়

যদি চলে যেতে হয়, তবে উদাসীন পৃথিবীতে রেখে যাবো
উষ্ণ ভালবাসা
মেঘ হয়ে মিশে যাব আকাশের উদার শরীরে
কিংবা বৃষ্টি হয়ে শান্তি দেব মাতা ধরিত্রীকে
শৈশবের সবুজ সকাল ও যৌবনের নিবিড় দুপুর
হৃদ্‌পিণ্ডে বাজায় আজ অতীন্দ্রিয় বেহালার সুর।

যদি চলে যেতে হয়, তবে চলে যাব
অনায়াসে অবলীলায়
কোন একদিন ডুয়ার্সের বনভূমিতে জড়িয়ে রাখব শরীর
অলৌকিক রাতের জ্যোৎস্নায়—
তিস্তার উপলে অন্ধকার দীপাবলীতে জ্বলে যদি চিতা
উত্তরের তরুণ কবি বন্ধুরা, ভালবেসে জল ঢেলে
ভেঙে দিও মাটির কলস
বৈদিক স্তোত্রের বদলে পাঠ কোরো কিছু টাট্‌কা কবিতা।

এতদিন সমস্ত সত্তা জুড়ে ছিল কবিতার শব্দের মিছিল
মানুষ পুড়ে যায়, কবিতা পোড়েনা কখনো
আগুনে ছাই হয় মানুষের দেহ
কবিতা দধীচির হাড়ের সামিল।

মানুষের বন্ধু থাকে না

এখন আমার কোন বন্ধু নেই
শেকড়ে বাকড়ে জড়িয়ে গিয়েছে সবাই
বন্ধুদের ঘরোয়া সংসারে সাজানো ফ্রেমের মত স্মৃতি,
কিছু চন্দন ফুল
চোখের সামনেই ছিল সুগন্ধি সেণ্ট, রোদের উত্তাপ।

কারো কারো বন্ধু থাকে না
কারো কারো বন্ধু দ্রুত জুটে যায়
অনেক ভালবাসা, পাশাপাশি হেঁটে চলা
পিছনে দীর্ঘ গাছের ছায়ায় কথা বলা,
জ্যৈষ্ঠের তীব্র রোদে পুড়ে যায় মাঠ
ডুয়ার্সের অরণ্যে হা হা করে গাছ।

আমি চিরকাল ঘরছাড়া
আমার পায়ের শব্দে সরে যায় মাটি,
ভেঙে পড়ে ঘর
এখন গৃহী বা ঋষির জীবনে কোন কৌতূহল নেই
মানুষের বন্ধু থাকে না, মানুষের বন্ধু থাকতে নেই।

জলের গভীরে

পুরণো সব কিছু ফেলে চলে যাই
রক্তের ভেতরে জড়িয়ে ছিল কোন সাপ
নাকি দূষিত কোন পাপ!

জলের গভীরে লুকানো থাকে সাধ
হাওয়ার ভেতর থেকে ভেসে আসে বেহাগের সুর
অচেনা কোন ফুল অলৌকিক বাগানে ফুটে থাকে
উড়ে আসে এক ঝাঁক পাখি
দুঃখগুলো এক হয়ে পাহাড়ী প্রপাত
জলের গভীর থেকে উঠে আসে
জ্যোৎস্না-ভেজা অপরূপ চাঁদ।

প্রেম প্রীতি ইত্যাদি

সুদীর্ঘ ছড়ানো উপলে প্রকৃতির সর্বনাশা ফাঁদ
কাঁপছে গাছের পাতা, অমাবস্যা গিলে খাচ্ছে অতে
চতুর্দশীর চাঁদ
বিচ্ছিন্ন জীবন কাঁদে সারা দিনমান
শিকল কেটে উড়ে গ্যাছে সুখের পায়রা গতকাল

অন্তরায় থেমে গ্যাছে গান
আকাশের রামধনু রঙে ছুঁড়েছে কেউ
অন্তর্ভেদী বাণ;
বাহারি রঙের ফুল চেয়ে আছে মৌন মুগ্ধতায়
প্রেম প্রীতি ইত্যাদি মুছে যায় রক্তের ধারায়।

আমার ভালবাসা

আমি ভালবাসি, ছন্নছাড়া জীবনের মতো
আকাশে উড়ে যাওয়া নীল মেঘ
ভগতপুর চা বাগানে সাঁওতাল রমণীর চোখে
কাঞ্চন ফুলের রক্তদীপ্তি
কালিঝোরা পূর্ত বিভাগের বাংলোবাড়ি থেকে
মেঘের ওড়নায় ঢাকা তিস্তার যুবতী শরীর

আমি ভালবাসি, নির্জন প্রান্তরে পাখির উড়ে যাওয়া
উত্তরের কন্‌কনে হাওয়া
কালিম্‌পঙের হাটে ফল বেচতে আসা
নেপালী তরুণীর স্মিত হাসি
পেডং বাজারে রডোডেনড্রণগুচ্ছের সাথে
ভুট্টার ফসলে ভরা জমি

আমার ভালবাসা, সমুদ্রের পাশে শুয়ে থাকা
এক দীর্ঘ বেলাভূমি।
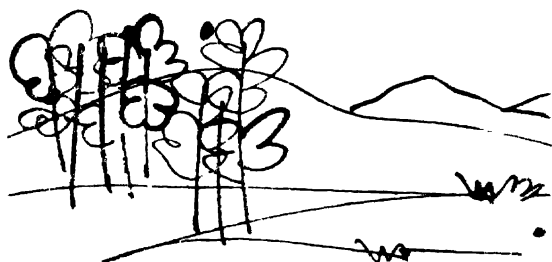
বিমল ভট্টাচার্য (১৯৪২)

কোথায় জ্বাললে আলো

কে আছো ঘরের মধ্যে দরজা খুলে দেখতে পাই না
অথচ আলোর নীচে সব স্পষ্ট, জামা জুতো ছবি
ঘড়ির আদুরে ডানা, মোমের ময়ূর-মূর্তি সবই
দিব্যি দেখা যায়, শুধু তোমাকে দেখি না।
কিন্তু তুমি ঘরে ছিলে, ঘরে আছো। একটু আগেও
একটা খুব অহঙ্কারী দাপট দেখেছি
একটু আগেও দুঃখে মিয়ানো গলার
কাঁদন শুনেছি, এই একটু আগেও
মমতা মাখানো দৃষ্টি বুলিয়েছো
জামা জুতো ছবি ঘড়ি মুকুরে।
তবে কেন তোমাকে দেখছি না
সমস্ত ঘরেই আলো, দশটা মার্কারি বাল্‌ব
ডিমার টিউব সব বিভিন্ন পাওয়ার
তুমিও তো ঘরে ছিলে, ঘরে আছো, অথচ অথচ—
কোথায় জ্বাললে আলো দেখা হয় চাক্ষুস সুন্দর?

পুরনো জলেই যাত্রা

পুরনো জলেই যাত্রা
স্তব্ধতার পার ঘেষে
স্তব্ধতার দিকে
সারারাত হাতে কিছু কুয়াশা সম্পন্ন মুখ
ঝুলানো বাতির
কাটাকুটি চলে মনে মনে
এ প্রকার মধ্যরাতে পুরনো জলেই যাত্রা
শরীর বর্জিত ছায়া
নিয়ে হেঁটে যাওয়া
শুধু তৃষ্ণা ধরে রাখে
ওষ্ঠের কিনারে আলো
শুশ্রূষায় অন্যতমা বোগেন ভিলিয়া।

একান্ত নিজস্ব

প্রেমের অন্যথা হলে বিষ দাঁতে আমাকে কাটিস
তথাপি চুড়ির শব্দ অন্য নিমন্ত্রণে বাজাবি না ;
বিষ দিবি পুষ্পস্তবে, পরম পরাণ বলে নেবো,
আয়োজন শূন্য হলে যথাচারে ভেঙো না প্রতিমা।
পাথরে বাঁধি না তোকে, প্রেম নামে চতুর্দেয়ালে
বাগিচার সাধ নেই, প্রতিগুচ্ছে বাগান আমার ;
অমসৃণ শিলাপটে রেখাকার ভগ্ন তালে রাখি
অনন্য নির্ঝরকল্প মমতায় প্রাণের প্রপাত।

ঢেউয়েও ভাঙি না তোকে, হে আলোক আনত প্রতিমা
মুখে অবয়বে ছাখো ভগ্ন স্তম্ভ ধ্বস অপচয়—
সবগুলো সিঁড়ি ভাঙা, বেলা গেলো, সজাগ সময়
কেবল দেহের ছায়া খাটো করে সুদূরে সরায়।
বিচালির 'পর শুয়ে অনুভবে এসো ফুল তুলি,
পরাগ পরাগ খেলে ভাঙি তটাশ্রয়ী জলরেখা॥

আলো নিভলে দাঁড়িয়ে ছিলে

আলো নিভলে দাঁড়িয়ে ছিলে
যেন অন্ধকার তা জ্বেলে দিয়ে যাবে
সারারাত করুণার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিলে
যেন করুণাই সংসার
কাছাকাছি হেন মানুষ ছিল না যার পকেট খুঁজলে
নিদেন পক্ষে একটা দেশলাই···না
হেন নারী না, যার কাছে
নেহাৎ একটি চকমকি ···· না
ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেছ আর হাড়ে হাড়ে
পাথরে পাথরে ঠুকেছ তোমার প্রেম, ভালবাসা
অন্ধকারে চতুর্দিক খোলা, শুধু
সারারাত তোমার বাতি জ্বলেনি।

দার্জিলিং

স্টুডিও ঘরের মধ্যে এসে গেছি
চারধারে অফুরান ছবি
কুয়াশার এনগ্রেভিং
উর্ধ্বগ বিমুক্ত ল্যাণ্ডস্কেপ
জল রঙে জ্বলজ্বল আকাশ
নীচে নম্র নীলের ওয়াস

ভেজা সবুজের গায়ে
প্যাস্টেলের স্নিগ্ধ বাড়ি ঘর
মোচড়ে মোচড়ে ব্যাপ্ত রেখার বিস্তার ছুঁয়ে
আবেশ মন্থর
ঘষ্ ঘষ্ শব্দে হাঁটছে ট্রেন।

যাও জলে, যাও জ্যোৎস্নায়

এখন কি ক'রে যাবে? আলোর বদলে
মনে রাখা জ্যোৎস্নায় পথ দেখে?
পিপাসা নিবৃত্ত করবে
মনে রাখা জলে?
জলের ছবিতে জল
জ্যোৎস্নার ছবিতে জ্যোৎস্না
এই নিয়ে চলে কত কাল?

আবার প্রথম দৃশ্য উদ্‌ঘাটন কর
যাও বাউণ্ডুলে, যাও পিছুপায়ে কিছু দূর
প্যাকার্ড পোস্টার নাও
নিশান ফেস্টুন নাও
ধ্বনি
আবার জলের জন্য জলে যাও
আবার জ্যোৎস্নার জন্য যাও জ্যোৎস্নায়।

ষষ্ঠী বাগচী (১৯৪৪)

প্রেম

কী যে হয়ে যায়, কখন কে ডেকে যায়
ঘুমে অচেতনে
কখন বয়স গড়িয়ে গেলে, রোদ বৃষ্টি জমে যায় বয়সের ভাঁজে

জ্যোৎস্নায় সারারাত ভিজে গেলে
পড়োশীরা ডেকে বলে, "আজ বড় সুদিন রে, নয়ন,
নদীর ও'পার থেকে কুটুমেরা এসে গেল"।

কই সে বাতাস,
ভিজে চুল ছুঁয়ে এসে ছুঁয়ে দিল—
সেই তো নয়ন, তারি নাম হোক,
নিজেকে জানাতে গেলে বলে ওঠে, দূরে যাক তাপ শোক
চোখের গভীরে চোখ
স্বচ্ছ জলে পরস্পর ছায়া ভাসে, ভেসে যায় দেখি

আমাকে 'নয়ন' বলে সেই ডেকেছিলে
এখনও সে স্থির থাকে পড়ন্ত বেলায়
কখন কে ডেকে যায়
ঘুমে অচেতনে গভীরে গোপনে।

তৃণভূমি জলাশয়ে

এই তো স্বাভাবিক এইভাবে পথ ধরে হেঁটে যাওয়া
পথ ধরে
যদি জ্বরের ঘোরে কিছু বেনামী ইমানদার
হাতে মাথা কাটে যখন তখন

অসময় বেড়ে ওঠে
কিছু লোক কথা ঘেঁটে ঘেঁটে
অবশেষে ক্লান্ত হয়ে ফিরে যায় হেঁটে

স্বাভাবিক জলাশয়, তৃণভূমি সহজে মেলে না আর
অসহ্য হয়ে ওঠে জীবনযাপন
পথের দূরত্ব নাগাল পেরিয়ে বেড়ে যায়

তবু স্বাভাবিক পথ ধরে হেঁটে যাই
উপেক্ষার ঝড়ে যতই লাগুক কাঁপন
তৃণভূমি জলাশয়ে।

খরা : পুরুলিয়া : ১৯৭৬

রুক্ষ বন্ধুর পথে হেঁটে গেলে সমস্ত প্রাকৃতিক সঞ্চয় জমে ওঠে,
অথচ তামাটে সূর্য অস্ত গেলে বাসা বাঁধে সরীসৃপ জীব
লুব্ধক শিশুবোধে মানবীরা হেঁটে যায় শিলায় শিলায়
রাত্রির ছায়া নিয়ে বৃষ্টির কাতরতা ফুটে ওঠে মুখে।

কোনখানে যাবে তারা?
এখনও শিশিরে ভেজেনি রাঙামাটি
নির্মম সন্ন্যাসী ধূলো উড়িয়ে আঁধি ডেকে আনে
নিস্তব্ধ মাটির বুকে শস্যদানা ফেটে যায় অনাদরে
সবুজ পাথেয় শেষ হলে, পড়ে থাকে পৃথিবীর শব
স্নিগ্ধ পানীয় আর অমল উদ্ভিদ্ নিজেদের ধর্ম ভুলে গেছে।

নিজেদের ছায়ার আড়ালে এইসব শিশু আর মানবীরা
তবু হেঁটে যায়
প্রান্তরের রুক্ষতায়, আলোয় ছায়ায়।

সংসারে পরবাসী

সব স্মৃতি গ্রাস করে কিশোর বয়স
জলে গভীর রেখা ছুঁয়ে যায় বিকেলের শেষ রোদ
প্রবাসী ঋতুর কাল শেষ হলে সব প্রাকৃতিক ঋণ শোধ
করে যেতে হবে—
সাংসারিক তুচ্ছতায় তারপর জমে ওঠে দেনা
কতটুকু ঋণ শোধ ? কার কাছে ?
নিজেকেই মনে হয় একান্ত অচেনা
কিশোর বয়স তখনই মেঘ আনে
মানে অপমানে
সমস্ত শরীর পুড়ে গেলে 'পর
সাংসারিক স্মৃতি গ্রাস করে
কিশোর বয়স তোলে ঝড়
জলের গভীর রেখা, বিকেলের শেষ রোদ
কী এক অব্যয় বোধ এনে দেয়

কিশোর বয়স ছেড়ে বহুদিন সংসারে পরবাসী।

অরণ্য

কখন ফিরিয়ে দিলে ফিরে যায় সামুদ্রিক পাখি
বাঘবন্দী খেলতে গিয়ে ক্লান্ত হয় মায়াবী পুরুষ
আরণ্যক পুরুষেরা শীতল জ্যোৎস্নার দিকে হেঁটে যায়
আপন নারীর কাছে পৃষ্ট হয়ঃ কেমন ছিলে, ভালো তো ?

সশব্দ অঙ্গীকার ভেঙ্গে পড়ে, আপন নারীরা ফিরিয়ে নেয় মুখ
"আমি তো অশ্লেষে বাঁধা আছি, আমিও তো ছিলাম উৎসুক"
বলে ওঠে প্রকৃতির একান্ত পুরুষ
বলে ওঠে, ফিরে যাবো অরণ্য উজান ধরে ধরে

তারপর ফিরে চলা হরিণেরা মানুষেরা পাশাপাশি
অরণ্য নেয় না কিছুই, নিলেও ফিরিয়ে দেয় সব
স্বপ্নের পাখি আর গাছ আর ব্যাকুল শৈশব
অরণ্যই কাছে টানে, দীর্ঘ গাছ অভিজ্ঞ ছায়া দেয় বহুদিন
একান্ত নারীও সরে গেলে, এই গাছ, এই ছায়া, ঈপ্সাবিহীন।

দু'একজন সম্পাকে

গ্রহণ শেষ হলে পাপবিদ্ধা কুমারীর মতো সরোজ সম্ভারে
তৃপ্ত হয় তপঃ রেণু
অঞ্চলে বাসনায় কী মুগ্ধ পরিণামে জেনে যায় তারা
ক্ষেত্রপতি অপেক্ষিত, শস্যহীন মাঠজুড়ে শূন্যতার প্রতিলিপি

তবু এইভাবে ভরে ওঠে সুখে পৃথিবীর মুখ
সুন্দরী রমণীরা ক্রমিক হেঁটে যায় উৎসবের দিকে
স্বাদুবৃক্ষের ফলে ভরে ওঠে অমর আস্বাদ
শৈশবের লীলাখেলা সংকীর্তনে দেয় হাতছানি ঃ
আমরা শুধু ভালবেসে, ভালবেসে স্নিগ্ধতায় ভরে আছি।

বারবার পৃথিবীর সুখী মুখ দেখে হেঁটে গেলে
বিকেলের রাজপথে দু'একজন শম্পাকে অপেক্ষিত দেখা যায়

জীবন সরকার (১৯৪৪)

বুনো রোদ

কলকলিয়ে সবুজ বনের শরীর ছুঁয়ে ছুটে যায় সুন্দরী নারী
কখনো ফুল ছোঁয়। গাছের পাতা ছিঁড়ে চলতে
থাকে নিজের খেয়ালে। আসলে শিখে নিতে হয়,
গ্রহণ করার সুষম বিন্যাস।
কেননা আকাঙ্ক্ষার বুনোরোদ ছড়িয়ে গেলে
নির্ধারিত পৃথিবীর ঘরে
পড়ে থাকে শূন্য মেলা। নারীকে…
ভালবাসা শুধু কয়েকটি উচ্চারণ নয়।

বাড়ি ঘর পেছনে রেখে

এই ভাবেই হয়তো সব কিছু
শেষ হয়ে যাবে। আমি চলে যাবো
রাতের ট্রেন ধরে
অনেক দূরে।

বেগমপুর স্টেশন ছাড়লে
বউবাজার। বাড়ি ঘর
শস্যের জমি পেছনে রেখে
রাতের ট্রেন ধরে
চলে যাবো বেগমপুর।

যে যায় সে যায়

যে যায় সে যায়
দগ্ধ দুপুরে
নারীর বুক একবিন্দু প্রেমের জন্য
অপেক্ষা করে থাকে।
অশ্রুসিক্ত কাঠ,
বর্ষা ধোয়া পূবাল হাওয়ায়
শুধু ভেসে বেড়ায়
যে যায় সে যায়

রণজিৎ দেব (১৯৪৫)

গুম্ফায় এসেছে শীত

হয়তো যাবেনা ফেরা, নিভন্ত আলোয় এসে সব পাখি জড়ো হয়
অনুপম ছায়ার আড়াল সব পাহাড় ঢেকে যায়
ঢেকে যায় জীর্ণছায়া শীর্ণ জলস্রোত।

হয়তো যাবেনা ফেরা গুম্ফায় এসেছে শীত পাহাড়ী ফুল শিশিরে ভিজে
শ্বাসরুদ্ধ বনস্থলী ঘিরে জ্যোৎস্নার বিভ্রম বৃক্ষশাখে বিষণ্ণ মউল
গোপন মোড়কে ঘোরে মৌমাছি সবুজের ক্ষেতে নির্বিকার
স্তব্ধতা নামে

যে নির্বাসন চেনে সে কখনো পুনর্বাসন জানেনা শুধুই অপেক্ষায় থাকা
অবিরল ভিজে স্মৃতির মধুময় ক্ষেত গুমরে উঠে মেঘমালা মায়াবী
কুসুমগন্ধ

হয়তো যাবেনা ফেরা ঘর কাঁপায় প্রবল বাতাস
শীত যায় রুক্ষ হয় চৈত্রের দিন শুকনো মাটিতে ঝরে শস্যের বীজ

গুহাচিত্রের মতো অন্ধকারে ছবিগুলি স্পষ্ট হয়
মণিপদ্মে চোখ আটকে রেখে দুঃখ হয়ে ভাসে ভূটানী মেয়ের শরীর
এ এক কঠিন সময়
হয়তো যাবেনা ফেরা, নিভন্ত আলোয় এসে সব পাখি জড়ো হয়।

ভালবাসা, কৌতূহলী খেলা

ভালবাসা দশমীর দেবী, পা ছুঁয়ে জলের গ্লাস পবিত্র করেছি
শেষ দিন এইভাবে শুদ্ধ হয় চলে গেলে যদি চলে যায়
শাঁখ বা কাঁসর ঘণ্টায় বিদায়ের বাজনা সে কি পরিতাপে সুখ!
সাত পাঁক ঘুরিয়ে গভীর জলে ডুবিয়ে রাখার জন্যে বুঝি এই
ভালবাসা, কৌতূহলী খেলা!

চলে যাবে জানি তাই পা ছুঁয়ে জলের গ্লাস পবিত্র করেছি
স্মৃতিকে করি কৌতূহলী খেলা।

তোমাকে অনেক কথা বলা হলোনা

তোমাকে অনেক কথা বলা হলোনা অথচ সময় যাচ্ছে চলে
পাতার ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো ঝলকে উঠে আঁধার আসছে ঘরে
আমি কি ভিনদেশী বাউল, যে সর্বক্ষণ হাতে একতারা উঠিয়ে ধুলো
উড়িয়ে হাঁটবো?

আমার পায়ের পাতা সোনায় মুড়োনো নয় যে অশ্বের গতিতে চলবো।
সিগনালের লাল রুমাল অনেক পেছনে ফেলে এসেছি এখন কি করে
থামবো
সময়ে অসময়ে বুকের ভেতর সজনে পাতার কাঁপন, গ্রাম্য পথের বাঁক
চেনা পায়ের শব্দ পেলে কখনো কখনো কেঁপে উঠে ভেতর বাড়ির কথা

তুমি অতো সতর্ক কেন মাথায় রেখেছো সহস্র মুকুট!
তোমার চারদিকে অনবরত প্রাচীর উঠছে ঘিরে মুহুর্মুহু তারই
প্রতিধ্বনি
অন্তরতম কথাগুলো তাই ফিরে আসে!
তোমাকে অনেক কথা বলা হলো না অথচ সময় যাচ্ছে চলে।

কথা ছিল

আজ আমাদের জেগে উঠা, উঠে বসার, পায়ে দাঁড়ানোর কথা ছিল
কথা ছিল হাত বাড়ানোর সবকিছু উপড়ে ফেলার
একদিকে নিভে আসে আলো কূলায় ফেরা পাখি দিকভ্রান্ত হয়
অন্যদিক থেকে জ্বলতে থাকে মশাল
শব্দ আর শব্দের গভীর কালো ধোঁয়া
কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে

অমল উদ্যানে সেই জ্বালাময়ী পাপ
কার পুড়ে গেছে নিজস্ব ঘরবাড়ি
রেখে গেছে উদাসী নির্জনতা
পুরনো জামা খুলে ফেলি, মুছে ফেলি সেই রং
জেনে নিই এর মধ্যে কে আমি, কতটুকু !

পুলিসের হর্ণ বাজে রাস্তার ধুলো এসে জড়ো হয়
ঝড়, ঘুর্ণি বুকের কাছে ঘোরে
আমি কতবার যাবো কলকাতায়
কতবার বিনি পয়সায় উড়িয়ে দেবো বকুলফুল ?

কেউ কাছে নেই মধ্যরাত নিষিদ্ধ এলাকায় দাঁড়িয়ে আছি
কেবলই পুলিসের হর্ণ ধুলো ওড়ে
শব্দ শব্দের গভীরে শব্দ উঠে আসা পাপ
জ্বলতে থাকা পুড়তে থাকা শেষ হতে থাকা

তুই না আমি

বৌদ্ধগুম্ফায় গিয়েছি পাহাড় বেয়ে কে কাকে যে উঠালো
নিবিড় বাতাস বইছিল কি না তখন
বুকের মধ্যে ছলাৎ করে ঠাণ্ডা দমকা
সে কি ঝর্ণার জল না তুই
এখনও আমি হিসেব করে বলতে পারলাম না।

মন্দিরের নিস্তব্ধতায় কে যে কাকে ঘুম পাড়ালো
নীল রঙের স্বপ্নে বিরাট একটা ধ্বস খসছে দেখে
কে যে কাকে জড়ালো তখন
তুই না মন্দিরটাই ছিল ওরকম
ভাবতে ভাবতে কোনও ভুল ধরা গেল না আজও

যখন হাওয়া ওঠে তখন মরুভূমির প্রান্তর দুই মেরুতে
না মিষ্ট গন্ধটাই অমনি
তোর বুকের রেখা খুঁজতে খুঁজতে দুটি পাহাড় গড়ে ওঠে
আকাশ শৈশব দূর সুরভির নিঝুম প্রান্তে
সুতো ছেড়ে দেওয়া ঘুড়ি উড়ছে কেবলই
ধনুকের ছিলায় ধরেছে টান—কে যে সুতো ছেড়ে দিল?

ফেরার পথ ভুল হয়ে যায়

ফেরার পথ ভুল হয়ে যায়
অচলায়তন   মধুরযামিনী যেন বন্দী ঘরে আছি
পাঁচ মাথার মোড় প্রাতঃ ভ্রমণ মনেই পড়েনা
নিরুদ্দেশ হয়ে যায় পথ কোনও এক মৃগনাভি নারী

তবুও দুঃখ নেই আমার
মানুষজন চারদিকে ঘিরে আছে বলেই আমি বলতে পারিনা
এবার পালাও সবচেয়ে বড় বাঘ আজ খাঁচা ভেঙেছে
মাংসল দেহে পড়বে লোভাতুর থাবা
জননীর আঁচল ঘিরে জেগে উঠেছে   বিষণ্নতা
নৈঃশব্দের দিকে

যেখানে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখেছিলাম !

প্রবল হাওয়ায় মৃগনাভি নারী   অচলায়তন
বাড়ি ফিরতে পারিনা আমি   ফেরার পথ ভুল হয়ে যায়
যে বন্দী ঘরে আছি

সূর্যাস্ত ঢেলেছে লাল চারদিকে অলৌকিক খরা।

চিলাপাতা ফরেস্টে ভোর

কখন যে সন্ধ্যে নামে চিলাপাতা ফরেস্ট জুড়ে
মহুয়ার গন্ধে মদেশীয় নারী
হাট হয়ে শুয়ে থাকে সোনাঝরা চাঁদের ছায়া।
পাখির কলরব ঐকতান হয়ে ঘুরে
ক্রমে তা নিথর হয় শিকারীর দুরন্ত চোখে।

কবে যে এই বন গড়ে উঠেছিল
অফুরান ছায়ায় ছায়ায় বেড়ে উঠেছিল
এ সকল মদেশীয় নারী।
চারদিকে শিকারীর পদছাপ দুরন্ত চোখ
শরবিদ্ধ যন্ত্রণায় তীব্র রোদ উঠে একসময়
আগুন হয়ে পলাশ ছোটে
দেখি প্রতিদিন দুপুরের ক্লান্ত ঘুম মহুয়ার আরক
মুকুল ঝরছে যেন ব্যাকুল আগ্রহে।

কখন যে সন্ধ্যে নামে চিলাপাতা ফরেস্ট জুড়ে
মদেশীয় নারী মাতাল হয় চারদিক থেকে মহুয়ার হাতছানি
অদূরে ডাকবাংলোয় একটি কুকুর ডাকে
ডাকতে ডাকতে স্তব্ধ হয় বন
ক্ষীয়মান পাণ্ডুর আলো নিয়ে একসময় ভোর হয়।

ব্রততী ঘোষ রায় (১৯৪৭)

আকর্ণ বিস্তৃত ভ্রূ ছুঁয়ে কেউ এসে যাক

আকর্ণ বিস্তৃত ভ্রূ ছুঁয়ে কেউ এসে যাক
এসে যাক নীলকান্ত মণিরেখার মত।
চক্ষু তারকায় গাঢ় রৌদ্রবিন্দু॥
দীর্ঘ পক্ষ্মে ভীষণ ছলনা.
অথচ দীর্ঘ করাঙ্গুলে প্রার্থনা বিঁধিয়ে,
কেউ এলে,
নদীমূলে কবোষ্ণ ছোঁওয়া লেগে
জলধারা কেমন অধৈর্য॥

ওপাশে মেঘ রং ফিকে রোদ
আলগা বাতাস ঘিরে
কাটা কাটা সুখ ছুঁড়ে ছায়।
কেউ এলে আশ্চর্য স্বরের ঢেউ
নদীমূলে,
দেখে নাও কি ভীষণ গভীর এই নদী।
এই জলবিন্দু॥

সন্ধি নেই

প্রমত্ত সমুদ্র থাকে এইখানে।
এই হাতে, একাকী এবং
তখনই সে যুবকের চুলে নামে।
ফেরারী মেজাজ নিয়ে প্রবল কল্লোল
দুই কানে।

চওড়া কপাল জুড়ে সে যুবক,
লাল ফোঁটা নিয়ে,
ডাকাতে পিপাসা নিয়ে
শুয়ে আছে।
প্রমত্ত বাতাস পেয়ে বৃক্ষেরা ওড়ালো সব শাখা

যে সন্ধিতে তুমি বাঁচো
সমুদ্রে সে সন্ধি নেই।
সমুদ্রের ঢেউ বুকে শুয়ে থাকা
যুবকে সে সন্ধি নেই।

কতদূর যেতে পারো

তুমি আরও কতদূর যেতে পারো।
হে প্রিয় সম্বিত, নষ্ট চিলের ঘর।
স্তর বিন্যাসে ভরা ঘর,
ভেজা জ্বালানীর মত সমস্ত অসময়
খেলা ঘর ভেঙে,
রৌদ্র রেখার মত ছুটে যাওয়া দিন।
সাজানো পালক, কথার ওপরে কথা।

নকশী কাঁথার মত একপাশে মেলে দিয়ে
কতদূর চলে যাও ? হে প্রিয় স্বস্বর
মূল শিকড় পেরিয়ে॥

শব্দের আড়ালে

হাওয়ারাও ফিরে যায় মৃদুমন্দ,
বৃক্ষকে নড়িয়ে দিয়ে মাঠ ঘাট ফেলে
নিশি পাওয়া বুনোজল ডোবে শেষ॥

শব্দ ব্রহ্ম ছুঁড়ে দিলে রক্ষা নেই
যতই আড়ালে যাও ছিঁড়ে যাবে
হাড়মাস পাতার নরম।
পুরোনো পাড়ায় রঙ ফিকে হ'ল
এ পাড়ায় তথাপি অসুখ॥

চাঁদের পাহাড় ভেঙে নড়ে যায়
মৃদু মন্দ হিসেবী বিকেল,
অসময় ভীড় করে গাছপালা
মাঠঘাট ডুবে যায় শব্দের আড়ালে
ফেরে শব্দশর॥

নিয়মের ধারে, বৃক্ষেরা

গেছে কি বৃক্ষেরা সব
ফুসফুস, পাঁজর ফাটিয়ে
নীল নাবিকের মত।
ঢেউ বোনা জমাট সাগর পলকে তরল হয়।
চোরাবালি, আলেয়ারা ফাঁদ পাতে
জাল বোনে॥

গিয়েছে কি বৃক্ষেরা, হালকা পালক পিঠে
পাখিদের মত?
ঠোঁট তুলে, আলতো ভ্রূদানে এঁকে
নীল টিপ?
সময় যে দু'হাত ওড়ায়।
বৃষ্টির মেজাজে আসে ঝরা পাতা॥

নিয়মের ভুল ভেঙে; গেছে কি বৃক্ষেরা কোনো
নিয়মের ধারে, নীলকণ্ঠ ফুল নিয়ে।
নাবিকের ঢেউ নিয়ে পাতার শিরায়
বিষম রঙের কোনো শিলালিপি॥

ক্রমশ আমাদের মজ্জাগত স্বভাব পেরিয়ে

ক্রমশ আমাদের মজ্জাগত স্বভাব পেরিয়ে
যখন সকলে এক জাহাজঘাটার দিকে
অবিরত অভিযানে চলে যাব,
সমস্ত ছিন্ন ছিন্ন হয়ে, অবিন্যস্ত
অস্থির সময়ে ॥

ঠিকানা ভুল হলে ক্রমাগত
চক্রবৃদ্ধি ঋণে অলঙ্কৃত হ'তে হ'তে
ধার নেবো অনিঃশেষ।
নিবিড় নিঃশব্দে কেউ সরে যায় তখন,
যেমন দুধারে যায় লতা পাতা,
ধার নেবো যে কোনো স্বভাবে
অনিঃশেষ।

যেমন নির্ভয়ে দেখি খোলা চোখ,
চোখের কাজল আর লতা পাতা ॥
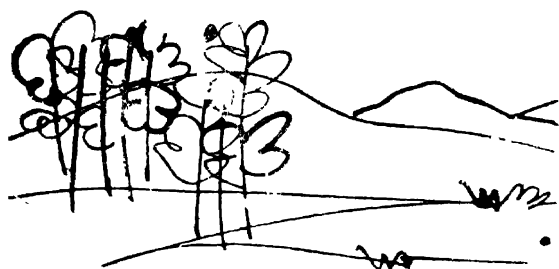
ডাকঘরে একা একা

কোথাও যাইনি আমি,
দীর্ঘাকার ভ্রমণের পথ
আবছা আঁধার তুলে, বাতাসের শিস বিঁধে
চিঠির মোড়কগুলো ফেলে গেছে
লাল রঙা ডাকঘরে ॥

কোথাও যাইনি তাই শব্দের ফেরি বাস
আঘাটায় চলে যায়,
মধ্যরাতে—
নিপাত নিঃঝুম ঘুমে ॥

কে যেন খুঁড়েছে সেই পোড়ো জমি।
আগাছার জমানো জঞ্জাল ছিঁড়ে
পিসন হারির কূয়ো জল ভরে বসে থাকে ॥

কোথাও যাইনি তাই স্বজনরা চলে গেছে।
বৃষ্টির ধোঁয়া রঙ জমে জমে
পাট ভাঙা ঘাস জমি ঘিরে নেয়—
চিঠির মোড়ক গুলো—
লাল রঙা ডাক ঘরে একা একা।

নীরদ রায় (১৯৪৯)

দুঃখের দক্ষিণ দিক্

দুঃখের দক্ষিণ দিক্ সামান্য বুক খোলা মাঠ
সাত কাহন গল্পের ভাঙা ইট—ছেঁড়া কাঁথা
কিছুটা জলের মুখ আর কিছুটা আগুনের হা
এই নিয়ে আত্মরক্ষা যদিও—,
সময় পা পিছলে পড়ে গেলে ঘুম থেকে জেগে ওঠে
শব্দের হাঁটাচলা—এই জেগে ওঠা কতটা সরল
কতটা প্রখর কোন্ দিকে তার প্রমত্ত ছায়া—
ভারতবর্ষের কাছাকাছি খালি গায়ে রোদ্দুরে দাঁড়াতে
পারে কিনা, খিদেয় ছটফট করে কিনা—
ছেঁড়া মলাটের ভেতর এই নিয়ে নিসর্গের বসন্তকাল
ছেঁড়া মলাটের ভেতর বুকে ব্যথা—
এই নিয়ে নিরন্ন খরার মাঠে প্রিয় কণ্ঠস্বর একা

একজন সহৃদয় মানুষও তার পাশে নেই!

একজন মৃতের প্রতি

গতকাল রাত্রির ডানপাশে আমি এক গোলাপ দেখেছি
এতোদিন যারা ঝড়ের কিনার থেকে মানুষের দুঃখকে
টেনে এনে গোলাপের গন্ধের ছায়ায় বসার জায়গা
করে দিয়েছিলো—
আমি তাদের জন্যে ঢলঢলে মলাটের এক স্বদেশ
দেখেছি গতকাল, পৃথিবীর সমস্ত নবীন আগুনের
ক্রোধ লাল রঙের জার্সি পরে বাহান্ন হাজার মানুষের
ভালো বাসার গালে চুমু খেয়েছিলো—আমি সাক্ষী আছি,
পৃথিবীর সমস্ত উচ্চমানের স্বাধীনতার আঠারো
বছর কেউ চুরি করে পালিয়ে যায়—
অর্জুনের লক্ষ ভ্রষ্ট মেধা তখন একজন মৃতের প্রতি সারারাত
শোক প্রস্তাবে ছুরি চালাতে চালাতে—
ক্লান্ত হয়ে পড়ে—আমি সাক্ষী আছি।

সময় ভুবনডাঙার মাঠে

সময় ভুবনডাঙার মাঠ পেরোচ্ছে
মাঠের এপারে তাই পুষ্টির অভাবে ঝিমোচ্ছে পুরনো
ঘর বাড়ি, স্মৃতিচিহ্নের হাঁটু অবধি এখনো গত বছরের
বন্যার ময়লা জল,—হাওয়ার সঙ্গে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে
অনেক বলা কথার সাজ পোশাক—,

সময় ভুবনডাঙার মাঠ পেরোচ্ছে—
মাঠের এপারে তাই কাঁটা তারের বেড়া
চৈতন্যের পিঠে প্রাপ্ত বয়স্ক চাবুকের ঘা
পঞ্চাশ বছরের পুরনো রাস্তায় এখনো সর্বনাশের
উচ্চারণ ছদ্মবেশে কেড়ে নেয় প্রাণবন্ত মেধার মুকুট—,

সময় ভুবনডাঙার মাঠ পেরোচ্ছে
মাঠের এপারে তাই বিশ্রীভাবে উইএ কেটে ফেলা
দিনের নষ্ট শরীর—মানুষ তবু মরচে পড়া পেরেকেই
তুলে রাখে গল্পের শ্রেষ্ঠ আহার।
যদিও সময় ভুবনডাঙার মাঠে।

তুমি কোথাও আছো—ভেবে

তুমি কোথাও আছো এইভেবে সুখের নির্জনে শীতের সকাল রক্তাক্ত
অবস্থায় পড়ে থাকে।
মানুষের দুঃখ নিয়ে পৃথিবীর সব নদী একদিন
গলায় দড়ি দেবে, কান্না নিয়ে সব পাখি একদিন
আকাশ ফুড়ে বেরিয়ে যাবে আর ফিরবে না কখনো,
একদিন উত্তর দক্ষিণ হবে আগুনের তলপেট জলের শিকড়—

তুমি কোথাও আছো এই ভেবে নিয়মিত একটা
রাস্তা পোশাক বদল করে—উঠোনের খুব কাছাকাছি
প্রিয় শব্দের জটলা, বিম্বিসার অশোকের ধূসর
জন্য এক লহমায় নতুন জামা পরে দশ লক্ষের
সমাবেশে ভাষণ দেয়—,

তুমি কোথাও আছো এইভেবে শূন্য হাড়ি
সহসা ভরে যায় গরম ভাতের ম ম গন্ধে অরণ্যের
ভেতর থেকে একা হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে আসে নবীন
বয়সের স্বাধীনতা—যেমন রাত্রিকে ঠেলতে ঠেলতে
বেরিয়ে আসে ভোরের রোদ্দুর।

নিরন্ন খরার মাঠে মানুষের আর্তস্বর

একজন মানুষও এখন আর আরেকজন মানুষের
কাছে নেই, পৃথিবীর সমস্ত কুচ্ছিত কাঁকেদের চিৎকার
এখন এক একজন মানুষের নিজস্ব রাস্তায় ব্যারিকেড করে
আছে এতোদিন যেসব বৃক্ষের মাথায় বসন্তের
স্বাস্থ্যল দিন পা রেখে দাঁড়িয়েছিলো—
যেসব নদী একান্ত নির্জনে মানুষের দুঃখ এবং কান্নাকে বুকে
নিয়ে ঘুরে বেড়াতো—
সেই সব বৃক্ষের কোমরে এখন সাইটিকার ব্যথা
মাথায় ভয়ংকর কুঠারের আঘাত
সেই সব নদী এখন শীতের কুয়াশাময় দীর্ঘ রাত্রির
পায়ে নীচে অর্ধমৃত অবস্থায়
মানুষের প্রত্যেকটি শোয়ার ঘরে কিংবা প্রতীক্ষার
সামান্যতম সমতল ভূমিতেও
দুমদাম ঝড় এসে ছিড়ে ফেলে কুসুমের লাজুক
সময়, শুধু নিরন্ন খরার মাঠে একা স্মৃতিচিহ্নের
মতো একা-দাঁড়িয়ে থাকে মানুষের আর্তস্বর।

শব্দের মুখ থেকে

শব্দের মুখ থেকে ব্যথা শূন্যহাতে ফিরে যায়
ব্যথার ঠিক পেছনে খালি গায়ে ভুবন ভাঙার মাঠ
সেই মাঠ বরাবর ক্ষীয়মান আলোর শৈশব, এখন
ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায়
একদিন সেইখানে তুমুল বৃষ্টি হতো—
মানুষের বুকে দাঁড়িয়ে থাকতো হাসনুহানার গন্ধ
সুখের কোনো পিতৃ পরিচয়ের দরকার হতো না
সমস্ত পৃথিবী জুড়েই প্রিয় কথার যেমন ইচ্ছে ব্যবহার

একদিন সমস্ত রাস্তাই স্বপ্নের কিনার ঘেষে

শব্দের মুখ থেকে ব্যথা শূন্য হাতে ফিরে যায়
ব্যথার পেছনে দুঃখী মানুষের ভাঙা কপাল
আঁধার লোকালয়—
একদিন সেইখানে তুমুল বৃষ্টি হতো—
একদিন পৃথিবীর সমস্ত রাস্তাই শিল্পের পা ছুঁয়ে
ক্রমাগত আলোর মধ্য দিয়ে—

মানচিত্রের রাস্তায়

যন্ত্রণার অন্দর ঘেঁষে—এখনো পুষ্ট হয়নি প্রতীক্ষার শরীর—
সুখের বয়স কত, বুকের আঁধার সেকি ফুলের মধুমাস,
প্রবীণ দেয়ালের পিঠে কারা এই সব লিখে রাখে,
সবুজ হয়নি আড়াল-জলের গভীর ছিঁড়ে ফেলে বকুলের বালকছায়া
মধ্যরাতে স্বপ্নের কিনার ভাঙে নদী ও নারী—
প্রবীণ শব্দের পাদদেশে কারা এইসব তুলে রাখে—,

একদিন প্রাক্তন দৃশ্যের ভেতর দুঃখের কারুকাজ
পৃথিবীতে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি এনেছিলো—
এখন তার জন্যে কাঞ্চন ব্যথার শিয়রে আঠারো বছর
একা দাঁড়িয়ে থাকা—আগুনের তলপেট জলের শিকড়—
শুধু কুয়াশা সরে গেলে রাত্রির আকাশ হয় হারানো কৈশোর
মানচিত্রের রাস্তায় জেগে থাকা আত্মার লোকালয়।

পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত (১৯৪৯)

কাগজ

কাগজ কি ভালবাসে ? ভালবাসা পায় ?
হরফ কাগজের বুক থেকে মাঝ রাতে উঠে এলে
মাঝ রাতে কাগজ কি জানে সে শূন্য ঃ
একেবারে নিঃস্ব হয়ে যায়।

গূঢ় অভিজ্ঞান

কঠিন পাথরে আমি নির্মাণ করি গূঢ় অভিজ্ঞান
স্বল্লালোতে ছায়া ফেলে যা মূর্ত হয় বিমূর্ত কলায়
শব্দের গ্রন্থিত আয়োজনে উচ্চারণ করি
কবিতার জন্যে জাগতিক সমস্ত উপাচার থেকে সরে দাঁড়াই।
কঠিন পাথরে কে ছুঁয়ে দেবে নম্র উদ্ভাবন ?
কঠিন পাথরে আমি নির্মাণ করি
গূঢ় অভিজ্ঞান।

রাত বারোটার পাখি

তুমি শুয়ে থাকো, শীতের তীক্ষ্ণ দাঁত রোমকূপে যে শিহরিত
তাকে তুমি পশমি কম্বলে ঢেকে আছো, আর আমি আরাম চেয়ারে
গা' এলিয়ে বসে আছি, কেবল যে পাখিটি
রোজ রাত বারোটায় ডেকে উঠতো, তার অপেক্ষায়
আমরা দু'জনে কান খাড়া করে আছি, এই ফাঁকে
আমার ভাবনার গাঁথুনি বেশ দ্রুত স্মৃতি ছুঁয়ে ছেনে
একটি অতীত প্রবাহ-কে আকৃতি দিয়েছে, তা হ'ল
আমাদের প্রাক্ বিবাহ পর্ব, যা কেবল আমরা
দুজনে জানি, বুঝতে পারি : কখন ডেকে উঠবে

রাত বারোটার পাখি ? নিহিত সময়, যেন মৃত
কিছুতেই রাত বারোটার ঘরে পা দেবেনা, এমন অপেক্ষা,
তুমি শুয়ে থাকো, শীতের তীক্ষ্ণ দাঁত রোমকূপে যে শিহরিত,
তাকে তুমি পশমি কম্বলে ঢেকে আছো, আর আমি আরাম চেয়ারে

এই বুঝি তুমি নড়ে উঠলে, চোখের পলকে আমি
বুঝে নিই অপেক্ষার আশ্চর্য স্নায়ুকোষ, নিদ্রাহীনতা
স্থবির সম্পৃক্ত ওষ্ঠ খুলে যায়, বাহুদ্বয় নড়ে ওঠে।
শূণ্য এই ঘরে একটি হলুদ বাতিদান, জ্বলন্ত ধূপকাঠি
টেবিল ক্লথের উপর তোমার পরিত্যক্ত ন্যাপকিন
দেয়াল ঘড়ির পেণ্ডুলাম একভাবে দোল খাচ্ছে
কেবল যে পাখিটি রোজ রাত বারোটায় ডেকে উঠতো
তার অপেক্ষায় আমরা দু'জনে কান খাড়া করে আছি
এই বুঝি রাত বারোটার পাখি ডেকে ওঠে।

এই প্রথা

মেরুন পাখিটি আজ নেই
মঞ্চ শূন্য, ক্রম-পরিণত অন্ধ আবক্ষ মূর্তিটির কালো
গত রাতে শেষ বারের মতো সে নেচেছিল।

আজকের নৃত্য শিল্পী অল্প পরিচিত
শুধু তার তনুদেহ রেশমের মতো লাবণ্য প্রভা
ক্যামেরার কাঁচে ফুটে ওঠে
আজ তার গুণগ্রাহী কেউ নেই
এই অসবর্ণ প্রথা।

গত রাতের মেরুন মেলডি আজ নেই
শুধু স্মৃতি জাবর কাটছে অডিটরিয়ামের মেয়ে-
ফ্রেমে বাঁধা যে ছবিটি একাডেমি অব ফাইন
আর্টসের দেওয়ালে ঝুলছে
তার প্রতি এতটুকু স্থিতি ও উৎসাহ নেই
তবু সভা বসে, গুণাগুণ পরিক্রমা হয়
এই প্রথা।

শুভময়

সে এসে চিঠি দিল, লাল খামে ভরা ফুল
কে সেই চিঠি পাঠালো, সোনালী গোলাপ
সে ঠিক শুভময়, ভালবাসা বুক ভরে নিয়ে আসে
সেই নাম চেয়ে নিই, সেই ফুল ভাসায় দু'কূল।

লাল খাম গন্ধে ভেসে যায়, খোলা চিঠি
কিসের পতাকা? খামে ভরা প্রিয় ফুল
সে ঠিক তরতাজা ভালবাসা বুকে করে আনে
সেই নাম চেয়ে নিই, সেই ফুল ভাসায় দু'কূল।

প্রেম

নখরঞ্জনী ফুটেছে ঠোঁটে, ব্যাকুল
ভালবাসা, ফিকে চাপা স্বর, রসাত্মক
চাঁদ লুকিয়েছে ঘন মেঘে
ললিত সুষমায় প্রস্ফুটিত হয় ফুল।

ঘন স্বপ্নের মতো

তুমি দেহ ভাঙছো
আর
গড়ছো অণুপ্রতিমা
চোখ তুলে
ছিঁড়ে দিচ্ছো
মেঘের উন্নাসিকতা
নদীর প্রবাহ তুমি
দু'হাতে
লুটেছো সারারাত
নক্ষত্রখচিত আকাশ নদী নয়
শুধু তুমি
আঙুলে তুলেছো
ঘন স্বপ্নের মতো।

স্বপনকুমার রায় (১৯৪৯)

কবি

তুমি ছুটে যাও কোন অন্ধকারে—অন্ধকারের গভীরতম
রহস্যময় শরীরে অনাবিষ্কৃত সেই রহস্যলোকে
একে একে স্বপ্ন থেকে স্বপ্নে কোথায় চলে যাও তুমি
হিমকুয়াশার দেশে, যেখানে কুণ্ডলী মেঘ ক্রমশ
ধূমায়িত হয়, নিঃশ্বাসে বেড়ে যায় বুকের স্পন্দন
শরীর বাঁকিয়ে তুমি প্রসারিত করে দাও কোন হাত ?
রক্তের নদীর স্রোতে রক্ত মিশে যায়—
তর্জনি তুলে হোহো দুঃখময় স্খলিত সুখজ মোহে
তুমি গড়িয়ে নাও তোমার সবুজ বন
রক্তাভ শ্বেত পাহাড় অথবা দৃষ্টিসুদূর নদী
যতই বেড়েছে রাত স্নায়ু আর তন্ত্রীতে দুঃখ বেড়ে যায়
আর ছাখো, এই যে দুর্মদ বাতাস—দুর্মদ ও
উন্মাদ—চারপাশে তোমাকে ঘিরে অন্ধকারে
সে কী বোঝাতে চায় ?···দুঃখ সুখ
অথবা অন্য কিছু ? তুমি দৃষ্টিপাত করে দাও

আহ্, অনুভবে দেখে নাও, তোমার আকুল বুকে শব্দ কেঁদে ওঠে ।

বেণু সরকার (১৯৫০)

এ কেমন পলাতক

বেশ তো পালিয়ে আছো বহুদিন মানুষের ভিড়ে
পাহাড়ী শহরে দূরে টিলার অফিসে অসহায়
মাঝরাত সাড়া দেয়, জংখা গানে ভরে যায় মৃদু
আলো হোটেলের হাওয়া। কৃষ্ণচূড়া আলথাল্লায়
তাজ্জব সুন্দরী ফ্রন্টশোলিঙ্ আধো ঘুমে টানটান—
পলাতক তুমি বেশ জীবনের প্রাকৃত জীবন
চিনে অসময়ে পাহাড়ী শহরে নিলে বাসা। কিছু
নেই যেন পৈতৃক ভিটেয়, নিদেন আলাপ ছিল
বহু, বহুদিন গল্পে গল্পে তুফান ওঠাতে
ফাঁকা টেবিলে। নিরস্ত্রীকরণে বড়ো জ্বালা! এখানে
সুন্দরী নেই প্রকৃত বিরহ নেই—ওষ্ঠাধর
জঙ্ঘা নেই—শূন্যতায় ভরা ওখানে পালিয়ে তুমি
মানুষের সঙ্গে মিশে অস্ত্রের কারুকাজে খুশি
তাই তো পালিয়ে ওহে বহুদিন ঝর্ণার দেশে।

টেরাইয়ের ছবি

এই নিয়ে কতবার তোমাদের দলে গিয়ে আমি
মিলিয়ে দিয়েছি গলা সুরে সুরে গেয়ে গেছি গান
তথাপি হয়নি আঁকা টেরাইয়ের নির্মল ছবি
কুমড়ো-ফুলের মতো হলুদ নরম যার সুর।

মোরগের ডাক শুনে যে ঘুম ভেঙেছে ভোরবেলা
সেই ঘুম চোখে আনে টেরাইয়ের নিবিড় বাতাস
তোমরা করেছো তাকে সমিতিতে স্বেচ্ছায় বধ
তবুও গেয়েছি আমি তোমাদের সুরে সুরে গান।

ঢেঁকিবন হাততুলে হাহাকার করেছে অনেক
পেয়ারার পাতা কেঁদে ফেলেছে চোখের নিশাজল
রূপোলী মাছের খেলা দেখে দেখে কেটে গেছে বেলা
তবুও হয়নি আঁকা টেরাইয়ের সুন্দর ঠোঁট।

মাঝরাতে বুনোপথে ঘনঘুমে অচেতন হ'লে
দুহাতিয়া শিকারীর হাতিয়ার ছিঁড়ে ফেলে বুক
পৃথিবীর ছায়াছবি এভাবেই যেন হয় শেষ;
তবু দ্যাখো কতোবার তোমাদের মিছিলের সাথে
হেঁটে হেঁটে ভুলে গেছি টেরাইয়ের ছবিগুলি আঁকা।

দিন যাপন

তোমার বৌকে বড় ভালবাসে প্রতিবেশী, অঢেল সুনাম তার
পাড়াময়। ধার-কর্জ জুটে অনায়াসে তার মহিমায়। ধার
করাটাকা দিয়ে মদ আনো ভাঁটিখানা থেকে। ড্রাইভার ঝাঁকামুটে
কেরাণীর ঝাঁক এসে ভিড় করে চারপাশে রাতারা'ত শূন্য হয়
সব কটা পিপে। ধার করা পয়সায় কোনদিনও ঘুচবে না
সঙ্গতি পরিবৃত পরিপাটি সংসারের ভ্রম। মদের ভীষণ
গুণ—ধারে বেচে সবটাই হাওয়া। পড়শীর কাছ থেকে আনা
ধার শোধরানো যায় না তা বুঝলে না মদের নেশাতে। খিদে
বাঁচানোর নেশা পেয়ে গেল মানুষের মতো, মানুষের খিদে
পেলে অমানুষ হতে তার থাকে না তেমন কোন বাধা। তোমারও
বাঁচার নেশা বর্তালো মদ্য ব্যবসায়ে, যদি কিছু লাভ হয়?
তাতে যদি হাসি ফোটে চার জোড়া মুখে, বিষণ্ণ বেকার বড়ো
ছেলেটার চোখে? অথচ বৃথাই শ্রম বৃথাই শুকনো ঠোঁটে
মদ্য ব্যবসায়, তার চেয়ে ভালো ছিল সব ভুলে রাত দিন
আকণ্ঠদেশী মদ্য পান, অন্তত ভুলে যেত সব ব্যথা
নীলকণ্ঠ হয়ে, অহেতুক হাহাকারে কেন তুমি নতজানু হলে?

জলকষ্ট

জলকষ্ট পেতে হবে চিরকাল এই যদি ছিল তার মনে
তবে কেন বানালো সে বাড়ি নিষ্ঠায় সুদীর্ঘ প্রত্যয়ে
এত যে সরল জল তবুও মার্জনায় নতজানু হতে হয়
তার কাছে একদিন। জলের রেখার কাছে পরাভূত হতে
হয় সকলের সব কিছু বেঁধেটেধে যেতে হয় মানুষের।
জলের সরল ভেলা মুছে নেয় সকলের আলস্য, দু-পকেট
ভর্তি ভয়, বুকের পকেটে মতো দুঃখ। তবে কেন সূচিপত্রে
রাখলে না জলের বোতাম, সে কি জানে জলভার বলে
কাকে! জানে সেই বিড়িওলা চাকদা স্টেশানে অন্তত
বিস্কুটও না খেলে জলহীন ক'রে রাখে যাত্রীদের;
ধর্ম তার স্থলপদ্মের মতো, দাতাকর্ণ নয় সে খুলে রাখবে
জলসত্র। তবু সে বিশাল বাড়ি, জলটুঙি নয় রাজকীয়
বসবাসে কাটাবে জীবন এই ভেবে ঘনিষ্ঠ প্রত্যয় নিয়ে
স্থলপদ্ম বানালো সে একদিন, রাখলো না জলের বোতাম।

জল ভার

ঘাটফেরতা তোমার অলৌকিক আবির সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক
আমার টাইয়ের নিচের প্রতিবেশীর অহংকার হবে তোমার।
পার্কের প্রচণ্ড ভিড়ে সবেমাত্র ফাঁকা হওয়া বেঞ্চটার দিকে
ছুটে যাওয়া কিশোরীর মতো চলে আসবো। নহবৎখানার
একাগ্রতা টের পাবে তক্ষুণি। আমার ঝোলায় রয়েছে সদ্য আনা
তালশাঁস তোমার জন্যে। অন্যান্য মানুষের মতো আমিও চাই
হামাগুড়ি দিয়ে দাঁড়াতে, ছুটে যেতে। ছুটে গিয়ে আউটডোরের
লাইনে দাঁড়াতে। কারণ প্রাইভেটে শুধু উজবুকদের চিকিৎসা
হয়। উজবুকরা বসে আঁকা প্রতিযোগিতায় যায়নি কোনো দিন।
না জানে লাইনে দাঁড়াতে না জানে রঙ তুলির সুষ্ঠু ব্যবহার।
কেবলি সারাংশ চায়, জল ভার জর্জরিত রমণীর সুর চায়।
পেতে চায় নহবৎখানার সংক্ষিপ্তসার, হাসপাতালের কেবিন ;
জলভার যদি সামলাতে না পারো আমি নাচার। ঘাটফেরতা
তোমার বিস্তৃত সুষমা পুড়িয়ে দিক অনন্তকালের ক্রোধ।

হাটবার

একে তো একমাঠ জল ভেঙে এসে দাঁড়িয়েছি
তার ওপর নাকে চাপতে হচ্ছে সস্তায় কেনা রুমাল
শুধু নোতুন কোনো ফসলের ভয়েই না
আচ্ছাদনেরও সুস্পষ্ট অভাব
সুতরাং এসব হাটবার পুরোপুরি পাল্টে দিতে ইচ্ছে করে
যেদিকে তাকানো যায় ফুলকপির অসম্ভব পাঁয়তারা
খেতে বসেও তার ভয়াবহ গন্ধে ছাপিয়ে যায় ভাড়াটে ঘরদোর
—ওরকম গন্ধওয়ালা শরীর এবার সামলাও
এখন আমার কম বয়েসীরও উল্টোপাল্টা ভয় নেই আর
বন্যার দিনে সে জেনেছে।
গা বাঁচানোর সংগত কায়দা-কানুন।

নীতীশ বসু (১৯৫১)

বাঘ
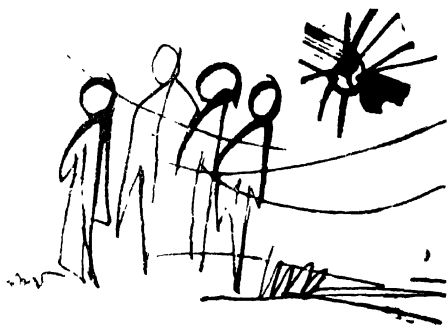
বনবৃক্ষের পাদভূমে আদিবাসী মেয়েটা বলল
বাঘ খুঁজছেন, বাঘ।
টালমাটাল আদিবাসী মেয়েটা ছুটতে ছুটতে
বাঘ দেখালো
বাঘ দেখলুম।
বাঘ নয়, অগনন গুলিবিদ্ধ শিল্পীসত্তা
খসে পড়া সমাজের চাঁদ।

নদী ও মানুষ

একটা মানুষ নদীর কাছে কথা দেয়
নদী হতে চায়,
নদী সে তো হেসে লুটোপুটি খায়, নাচে—
বলে, মানুষটা পাগল!
মানুষ নদী হ'তে পারে?

শিল্পীরা বড় অভিমানী হয়

শিল্পীরা বড় অভিমানী হয়
হয়ে যায় বিচ্ছিন্ন
শিল্পীরা বড় তেজস্বী হয়
গিলে খায় নদীনালা ঘরবাড়ি মানুষ বৃক্ষ
আকাশ……

শিল্পীরা মাথা নত করে শিল্পীর কাছে
কল্পনার শেকড়হীন মানুষগুলো স্নায়ুযুদ্ধে
হেরে যায়

মানুষ শিল্পী হয়
শিল্পীরা মানুষ।

হায় বিশ্বের সন্তানসন্ততি

ভরা জ্যোৎস্নায় খসে পড়ে আজ কুষ্ঠের মত সমাজের চাঁদ
বিচ্ছিন্ন অবয়বে ভরে যায় মরা মাঠ।
মানুষের বেঁচে থাকা দৃঢ় প্রত্যয় প্রতিশ্রুতি যেখানে নির্বিকার
সন্তাপে ডুবে যায় যে প্রিয় পৃথিবী
মৃত্যু, সেই ছিল ভালো, হোক সে কলঙ্ক কিংবা প্রহর্ন।

রাজা সরকার (১৯৫২)

কালো আকাশ

এই সেই গূঢ় সমুদ্রের পৃথিবী, কালো আকাশের নীচে
এক দণ্ডিত প্রণেতার পৃথিবী—রেখে যাচ্ছি চেয়ে ছাখ,
শুনে নে একেকটি দুয়ার খুলে সেই সমুদ্রতাড়িত
অরাজক গান, যে গান আমাদের স্বপ্ন ও নিষ্ঠুরতার সুরে···
বিদীর্ণ হলেও শোনানো যাবেনা আর, যে ধর্ম
শুধু আতংকের প্রতীক আমাদের গ্রস্থ ভালবাসায়,
—আজ এই অবশিষ্ট আলোয়, এই স্তব্ধতায়
তা ফিরিয়ে নিলাম।

······তবু এখানেই কোন সৌন্দর্যে
আমাদের হিমায়িত ভ্রূণ ঘৃণা ও সহবাসের ভেতর, যেখানে
তুই শুয়ে আছিস চেয়ে ছাখ চোখ খুলে এই
খোলা আকাশের নীচে একটিই বিবর্ণ ফুল, যা
খুঁজে পেতে রেখেছি আধফোটা,—ফুটিয়ে নিস্······
ঘ্রাণ ও চুম্বনে আবারও পৃথিবীর নাড়ীতে, আমাদের
ভাষাহীন বধিরতায় কিছুটা আদিম কোলাহল ডেকে আনিস্॥

এসো,—একবার ছুঁয়ে দেখো

নিজস্ব স্ফূটন সীমায়—ঐ বারুদ চিহ্নের কাছাকাছি দাঁড়ালেই
পটভূমিতে তুমি, দুর্লভ মানসী-শরীর ভেসে ওঠে তোমার
ওগো কি তাড়না লুকোনো এই পাখনায় শুধু জল কাটে—বরং
ধার্য সীমায় এসো, পার্থিব স্পর্শে একবার ছুঁয়ে দেখো
কত আঁশ জমে আছে শরীর জুড়ে নির্বিচার···

এই সব গোপন উদ্‌যাপন সপ্রাণ রক্তের ভেতর, আমি পারি না
মুছে দিতে নিজস্ব মুখোশ, মুখের রেখা বা ভাঁজ—বরং গোপনে
এই মুখ থেকেই আমাকে শুষে নিতে হয় তীক্ষ্ণ চুম্বনে এই সব
অসহ আগুন···

নিজস্ব তরলের ভেতর বীজ শেষ পর্যন্ত কেউ বাঁচাতে পারেনি
লিপ্ত মাছের যন্ত্রণায় রাত্রির ভেতর থেকে শুধু আঁশ আর আঁশ
হাঃ আত্মরতি! ঐ সব মানুষের মত আমিও আমারই নষ্টবীজের
পাহাড়ায়
আসলে ধার্যসীমার দিকে সমস্ত বন্ধন আলগা করে দাঁড়িয়ে আছি—
এসো, পার্থিব স্পর্শে একবার ছুঁয়ে দেখো কত আঁশ···

বিশ্বনাথ দাস (১৯৫২)

বিসর্জনের কবিতা

সমস্ত আয়োজন মিটিয়ে পুজো শেষ হল
এবার ওঠো, উঠে পড়
মণ্ডপ জুড়ে পড়ে রইল ফুল, বিল্ব-পত্র, অর্ঘজ্যোতি
আরতির পোড়া কাঠ, যজ্ঞের পাট-কাঠি আর শোকাতুর ছায়া—
দূরে ঘাট পারে ভাসানের অলৌকিক কান্না বাজায় ঢাকী
ভীষণ করুণ লাগে তোমার মুখ, অবশিষ্ট শরীরের এই মাটি
আমাদের প্রাণে কেউ জেগে নেই, আমাদের স্বপ্নে আর কেউ
জেগে নেই
ঘুমের মতো গাঢ় চেতনায় শুধু তুমি থাকো
এবার উঠে পড়, দু' চোখ মুছে নাও—
ভাসানে যাবো
মাঝরাতের জ্যোৎস্নায় মধ্যনদীতে একা আমাদের ডিঙ্গি
ভাসানে যাচ্ছে—
যাত্রা শেষ, এবার তুমি ডুবে যাবে বিষণ্ণতার জলে
দিগন্তে চাঁদও ডুবে যাচ্ছে ধীরে ধীরে—
স্তব্ধতার হাহাকারে ডুবে যাচ্ছে সবাই,
এমন কি চেনা তারা, নক্ষত্রগুলোও ডুবে যাচ্ছে
মাগো ! এবার আমরা ডুববো ॥
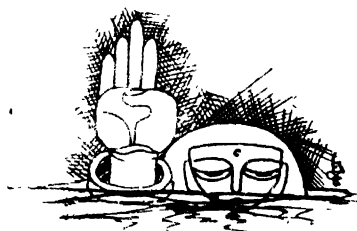
চিলাপাতা ফরেস্ট

আমাদের আদিম বন্যতা বাসা বাঁধে চিলাপাতা ফরেস্টে
শালপাতার মতো গোল হয়ে গুটিয়ে পড়ি পরস্পর
খসে পড়া জিব, খসে পড়া চোখে ঝুলে থাকে
বিষাদময় চিলাপাতা ফরেস্ট।

শেকড়ে শেকড়ে বিস্তৃত হয় আমাদের চুম্বন সমস্ত বনভূমি,
ভয়ানক বন্য হয়ে উঠি

তোমার কি মনে পড়ে,
ঝুল বারান্দাহীন সেই নিশুতিরাত আর চিলাপাতা
বুকে বড় ব্যথা আজ,
ব্যথা না কি কারো নূপুরের ধ্বনি ?
গাছের কোটরে আদিম বন্যতায় জ্বল জ্বল করে
তোমার চোখের মণি—।

প্রদর্শনী

দীর্ঘদিন পর তোমার বাড়িতে কাটিয়ে এলাম

দুপুর গড়িয়ে তৈরী হল বিকেল আর সুন্দর এক সন্ধ্যা
পুরানো কথাবার্তা, স্মৃতি
মুখ বুজে পড়ে রইল আমাদের পাশাপাশি
নিঃশ্চুপ

তোমার বাড়ির চারদিক খুব সুন্দর, সাজানো-গোছানো
লতাগুল্মময়
ভেতরে ঘরভর্তি বিয়ের নানা উপহার-আসবাব,
শো-কেসে দম দেওয়া বাজনা
ভ্রমণের রঙিন ফটোগ্রাফ

ঘরের এককোণে ছ' ইঞ্চি পুরু গদির চেয়ারে বসে—
আমন্ত্রিত অতিথির মতো তোমার দু' চোখে দেখে এলাম প্রদর্শনী

পালটে গেছো তুমি, তোমার নিজস্ব ব্যবহার রীতি-নীতি
আজ তুমি শহরের যে কোন এক আমলার স্ত্রী।

বাবা

দীর্ঘদিন পর আমি আবার বাবার সমুখে দাঁড়াবো
মেঘলা আকাশের মতো আমার মুখ ও চোখে
থাকবে না আর কোন উচ্ছ্বাস
শান্তচরিত্র বাবা কিছুই বলবে না
শোবার ঘরে খাটের এক কোণে বাবারই পাশে
আমি বসে পড়বো
মানুষের শরীরে রাজকীয় অসুখের অবদান যেমন চুপচাপ থাকে
তেমনি খুব দুঃখিত, কোন কথা বলবো না
আমার ভগ্নদশা দেহের দিকে তাকিয়ে—
দিনান্তের চিহ্ন দেখে বাবা সবকিছু অনুমান করে নেবে

দীর্ঘদিন ধরে আমার পথের গল্প
ধুলি-ধূসর কাহিনী-চিত্র
বিপ্লবী কায়দা-কানুন
জলছবির মতো বাবার দু'চোখে ভাসবে
আর সূর্যাস্তে, দুঃখিত হয়ে উঠবে বাবার দু'চোখ
দশ আঙুলে ভগ্নমুখ আড়াল করে
আমি আমাকে ঢাকবো

ক্রমশঃ সমস্ত অনুতাপ, বিরুদ্ধতার পরাজয় ইত্যাদি গ্লানি নিয়ে
শামুকের মতো গতিতে আমি নিজেরই মধ্যে গুটিয়ে পড়বো—
করতলে মুখ টেনে নিয়ে, বাবা আমাকে বোঝাবে
ক্ষমা করবার কথা

এভাবেই এক সময় বাবার শরীর যখন ঠাণ্ডা হয়ে আসবে—
নড়বড়ে চৌ-চালার উত্তর দিকে
কা-কা করে ডেকে উঠবে লক্ষ্মীছাড়া কয়েকটি কাক,
মধ্যরাতে ট্রেনের চাকার শব্দে পিষ্ট হবে দূরগামী কান্নার রোল
আর আমি
অমাবস্যা-অন্ধকারে বাবার ফেরার সেই লোকান্তর পথে
জ্যোৎস্না ছড়াতে ছড়াতে বাবারই পাশাপাশি
চাঁদ হয়ে জেগে থাকবো…

জটাভার

সে ভুলে যেতে বাধ্য হয় তার সংসার, সন্তান-সন্ততির কথা
আর বাড়ির গৃহিণী, বাতাবী লেবুর ঘ্রাণের মতো
যার স্মৃতি তাকে জাগিয়ে রাখতো দীর্ঘরাত।

একদিন সে হেরে যায়।
কাঁচের জানালায় ঝাপসা প্রতিবিম্ব প্রতিদিন
একটু একটু করে নতজানু হয়
আর অন্ধকার ঘন রাতে দু'চোখের মণিতে তার
খেলা করে গৈরিক বসনে অলৌকিক জাদুকর নৈঃশব্দ্য গম্ভীর।

সাংসারিক জীর্ণ বাস ত্যাগ করে,
একাকী সে পার হয়ে যায় নিবিড় দীর্ঘ বনভূমি
ক্রমশঃ জটাভারে নুয়ে পড়ে ক্লান্ত শরীর।
সে ভুলে যেতে বাধ্য হয় তার জন্মদিন আর ফসলের কথা—

সে হাসে পবিত্র, নির্মল অজস্র হাসি…
ঘুমন্ত দেবশিশু যেমন হেসেছিল ঈশ্বরের মুখোমুখি।

শব্দই আমার শুভাশুভ কঠিন মায়া

শব্দের আগুনে দগ্ধ হই দিনরাত
শব্দই আমার সহযাত্রী শ্মশান-বন্ধু
মুকুটহীন সম্রাটে সজ্জিত স্বপ্ন—উদ্যানে
শব্দ ফুল ফোটায় রমণীর শরীর
শহরের আঁকাবাঁকা পথে ধুলো উড়োয়ঃ
ভালবাসা ম্রিয়মাণ কথোপকথন।

শীতার্ত পৃথিবীতে শব্দই আমার উষ্ণ পোশাক
বালকবেলায় হাতের পুতুল
যৌবন গোপনে তপ্ত পরাগ রেণু
শব্দ-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বসে থাকি
বসে থাকে যেমন গৈরিক বসনে ধ্যান-মগ্ন যোগী

শব্দ শ্লোক পুরোহিত. পবিত্র নামাবলী
অন্তর মন্ত্রে ঢেকে রাখে
সুখ দুঃখ শোক
জরা মরণ ব্যাধি
শব্দ শ্লোক মূলতঃ নৈঃশব্দ্য, শান্ত পৃথিবী।

শব্দই আমার জীবনঃ বোধিবৃক্ষ—জীবাশ্ম ছায়া
শব্দই আমার শবদেহ, শুভাশুভ কঠিন মায়া।

জন্মান্ধের নষ্ট দু'টি চোখ

রাত্রি থেকে বেরিয়ে এলো অন্ধকার
অন্ধকারে স্পস্ট হয় নগ্ন দু'টি হাত

স্পর্শে স্পর্শে উত্তপ্ত হৃদয় ফোটালো কুসুম, স্বপ্ন এবং ভালবাসা
ভোরের আলোয় সূর্য কানে কানে জানিয়ে দিল—
—বিক্ষিপ্ত ওষ্ঠ, বিষাদ কর্পূর

ক্রমশঃ রতিক্রিয়া নয়; নষ্ট রশ্মিতে স্পষ্ট হলো—
যেন কোন নারীর বিষাদ-সুন্দর মুখ,
শারীরিক অসুখ

বাড়ি ফিরতেই নিজস্ব আয়নায় দাঁড়িয়ে নিখুঁত যুদ্ধশেষে
পরাজিত সৈনিকের রক্তাক্ত, অভিজ্ঞতাহীন অনুজ্জ্বল মুখ।

ব্লটিং পেপারে শোষিত প্রেমবিষয়ক
সমস্ত প্রিয় শব্দের আবির্ভাব

ভালবাসা মূলতঃ কিছু নয়, যেন
কোন জন্মান্ধের নষ্ট দু'টি চোখ।

সমীরণ ঘোষ (১৯৫৩)

বাঘ

রাত্রির প্রহরে প্রহরে একটা বাঘ
আকাশের ছেঁড়া মেঘের দিকে তাকিয়ে
দুর্বিনীত থাবা বাড়ায়, উঠে দাঁড়ায়
তার রাজকীয় রূপে-স্বরূপে
অরণ্য স্বেচ্ছায় অন্ধ ও নিঃসাড় হয়ে থাকে—

কিন্তু প্রতিধ্বনিময় অরণ্যে পরক্ষণেই বাঘটা
অসহায় বোধ করে, মনে হয় বিদেশ বিভূঁই,
নিজস্ব গর্জনের কাছেই বিকিয়ে যায়
তার সর্বস্ব, তার সর্বাঙ্গ থেকে
ঝুপ্ ঝুপ্ ঝরে পড়ে স্পর্ধা স্মৃতি বিশ্বাস।
বাতাসের গায়ে নির্জীব একটা হাই তুলে
ফের শুয়ে পড়ে,

কালো আর হলুদ নিদ্রায়
নিশ্চপ একটা বাঘ আর তার ব্যর্থতা।
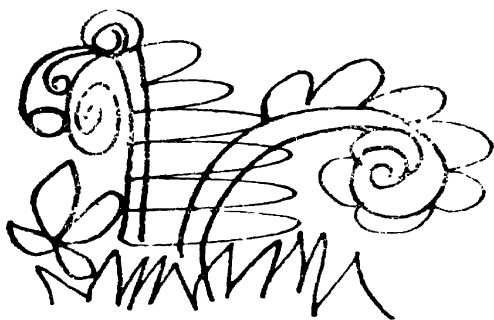
আমার পায়ের তলায় আমারই বশংবদ বিক্ষত ছায়া
উজ্জ্বল বর্ণবিকিরণের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজেকে করুণা করতে
ইচ্ছে করে
মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে মানুষের ভালবাসার
স্বর্গগামী বেলুন, প্রচণ্ড আলোর নীচে
পৃথিবীর হাড় পরিচ্ছন্ন, নিষ্পাপ, সাদা,
এমন পবিত্রতার মধ্যে পোষাকী আত্মীয়তা নিয়ে
কেউ কাউকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, 'এখনও সময় আছে'
কোথাও রুমাল নড়ে উঠছে, বহু উচুঁ থেকে কেউ
পর্দা সরিয়ে তাকিয়ে আছে নীচে,
কেউ মাটি থেকে উপরে—

এই গন্‌গনে আহ্লাদের মধ্যে আমার আত্মার কেন্দ্র
খুঁজতে খুঁজতে সহসা বুঝতে পারি কেন একাধিক চাবি
একসাথে গুচ্ছ করে রাখা হয়
ঝন্‌-ঝন্‌ শব্দে চাবির গোছা পড়ে যাবার শব্দ
মস্তিষ্কের ভেতরে গেঁথে আছে মনে হয়
কিন্তু আমার অধঃপতনের কোনো শব্দ হয় না।

আমি আর দু'প বাড়িয়ে যাই নি জিজ্ঞেস করি নি
'কি তোমার নাম' দু'পা পিছিয়ে এসে বসেছি দেখেছি কেবলই
সেই ঘাস সেই পাত্র নির্বিবাদী সেই অবসর
মাংসাশী হৃদয়ে সেই পিচ্ছিল প্রার্থনা 'এসো হে অনন্ত'
দূরে কাদের কর্মবিরতির ঘণ্টা বাজে
অন্ধকারে ডুবে যায় সাঁকো সন্তর্পণে তাঁবু গুটিয়ে
যোদ্ধারা আরও কোন গূঢ় যুদ্ধের দিকে চলে যায়
টের পাই গাড়ি টানা একটা মোষ আমার গায়ে
শ্বাস ফেলে 'চীয়ার্স চিন্ময়' আমাদের আর কোনো
কাজ নেই বিভিন্ন বিরতির ভেতরে আমাদের জেগে ওঠা
ততক্ষণে গ্রামান্তরে ফিরে গ্যাছে শহর ফেরৎ মানুষ ও বিপ্লব
বাতিল হয়ে গ্যাছে বিধানসভা অথবা হাতের শাঁখা গর্ভের সন্তান

আমাদের পিতৃত্ব স্বীকৃত হউক অস্বীকৃত হউক
দু'পা পিছিয়ে এসে বসেছি দেখেছি সেই ঘাস
ঘাসের ভেতর থেকে খুঁজে নিচ্ছি সেই পাত্র
এই তো যথেষ্ট আনুগত্য ॥
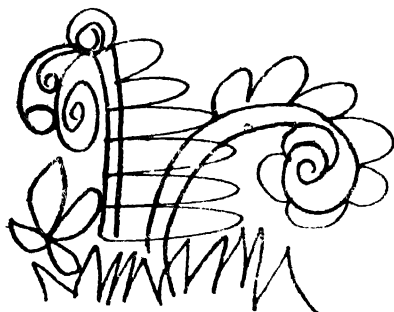
অন্যমন দাশগুপ্ত (১৯৫৪-১৯৮০)

মহোপল কবিতাবলী

একদিন

বৃষ্টির জলে থরথর ক'রে কাঁপতে থাকলো
জাম গাছের পাতা
আর নীচে
সুন্দর একটি কাক এসে ব'সলো
গাছের ছায়ায়

আর একদিন
বৃষ্টি কিংবা ঝড় কিছু হ'ল না
শুধু
একটি প্রতিক্রিয়াশীল গাছের
পাতাগুলো
হা হা করে হাসতে থাকলো

১৩৮৫

এত বৃষ্টি এবার এই প্রথম, ঝড়ও।

ডাকঘরে দাঁড়িয়ে তাদের চিঠি লিখছিলাম
যত পিছিয়ে পড়ার চেষ্টা ক'রি দেখি
এগিয়ে যাচ্ছি,
ভাবি, এসব তো বলার ছিলো না, কবে এলো?

আর ভোর বেলা বিছানা ছেড়ে উঠবো না, আর
রাতে কবিতা লেখার আগে ব্যবহার ক'রবো না
কালো টেলিফোন।

১লা বৈশাখে সমস্ত রাত ট্রেনে কেবল একঘণ্টা
ঘুমিয়েছি, ডাকঘরে সে-কথা মনে পড়তেই
ঘুম পেলো, ভীষণ ঘুম পেলো।

আমার এত ঘন ঘন ঘুম পায় কেন তেরশ' পঁচাশি?

আজ

এই আকাশ, গাছের স্তব্ধপাতা সমস্ত আমার থাক,
তুমি ওই অগণন মানুষের ভিড়ে যা খুশি ওড়াও।
এলো, এই অন্যরকমের জীবন,
আজ, এলো সবুজে ছড়ানো ঘরবাড়ি
অনর্থের খাঁচা থেকে মুক্ত হ'লো অধমের ভাষা…
আজ আমি শ্রমের বিকল্পে পাই ভালোবাসা…।
কথা বাড়ে, গাছ ও পাখির আর শস্যের প্রিয় কথা

ঠাঁই

অসাড়তা শিল্পের ভিতরে ঠাঁই নেয়?
বই পোকা ঘুম থেকে
ওঠে
বলে, সে কোথায়?

বলো বিহ্বলতা, তুমি কোথা যাও
যোজন উজানে? হিংস্র
হয়ে ওঠে আরো শিল্পের জনক।

রাজাদিভাই ও জলতরঙ্গের কবিতা

ঘরে তোমার চরণ দু'টি রাখো
যেভাবে শিশু ছড়ায় সাদাফুল
মাটি ও জল হৃদয় জুড়ে থাকে
ঘরে তোমার চরণ দু'টি রাখো

মৃতের ভস্মে তরল ঢেলে দেয়
যারা, তাদের শ্মশান বন্ধু বলে
এরা কেবল আসে এবং যায়,
তুমি আমার চিরকালের ঠাঁই

তুমি আমার নিবিড় বেদনায়
শিশু হাতের সাদা ফুলের মতো।

এয়ারকুলার

কোন দিকে যাবো?
অনড় দাঁড়িয়ে থাকি একা
রুগ্ন দেশ, বৃষ্টি হ'লে বাড়ে ফুলবাগানের শখ
রুগ্ন দেশ, বৃষ্টি হ'লে শস্য ডুবে যায়।

কোন দিকে যাবো, আমাদের এয়ারকুলার?

ছবি

মাইকেলের কবরের সামনে বিদেশিনীর দু' বছরের
নাত্‌নির কবর
মৃত্যু, একজনকে জল দেয়া
অর্থাৎ সে বেঁচে গেল, অর্থাৎ
সে আর কোনদিন একা থাকবে না
প্রতিদিন হলুদ বৃষ্টি হয় প্রত্যেক কবরে;
বিদেশিনী ঘুরে ঘুরে
নাত্‌নির কবরের ওপর হাত রাখেন
আর মুখোমুখি কবিকে কবিতা শোনান
এখানে, কেউ আর কোনদিন একা থাকবে না।

প্রভাত লাহা (১৯৫৪)

জ্যোৎস্নাতে বৃষ্টি নামে

হলুদ বসন্ত মোড়া একটা মন, ছিন্নভিন্ন হৃদয়
থেকে বের কোরে আনে পাতা ঝরার গান
তুমি চলে গেলে বিদায়ী বাঁশি কেঁদে যায়,
তোমাকে কাল দেখেছি যে অরণ্যে ছেঁড়া পাতায় পাতায়
বিধবা কেশের মতো এলোমেলো জ্যোৎস্নার আঁচলে।

কৃষ্ণচূড়ার দেহে সোনা ঝরা রাধা চূড়া
বিছিয়েছে ভোর আকাশ, স্মৃতি বড় টানে—
স্মৃতি মাঝে মাঝে উর্বর বৃষ্টি নামায়;
তার মৃত্যু, আকাশ ভরানো যাবে না কখনও।

যাই যাই করেও হয়নি, যেতে গেলেই
জ্যোৎস্নাতে বৃষ্টি নামে।

বোবা কোকিলের মুখে শব্দ

আকাশে মেঘ জমলেই, বৃষ্টি নাও হতে পারে
গাছে কুঁড়ি এলেই ফুলে ফুলে গাছ-নারী নাও হতে পারে,
তবুও একটা বোবা কোকিল পথ ভুল করে,
দু' চোখের পাতা ভেজায়, মধুর অপেক্ষায়
ঘাসফুলের মতো কথার পর কথা জুড়ে মালা গাঁথে,

ফুল ছিঁড়ে ফ্যালে, শব্দের প্রতিটি অক্ষর মুছে যায়।

রথীন্দ্রনাথ রায় (১৯৫৭)

সংসার বাড়ে

বাতাস আসেনা যথাযথ
তবুও ওদিকে শয্যা পেতেছো
অসুখের পর থেকে তোমার খোলামেলা
জায়গা দরকার স্নান দরকার পরিচর্যা এবং
টুকিটাকি গল্পগুজব

অথচ তুমি নিরন্তর মাথা খুঁড়ছ
সিঁথির সিঁদুর লেপটে আছে কপাল
বিষাদ প্রতিমা

যেভাবে তাকাও
জটিল হয় হিসাব মেলানো
বুক ভরতি ফাঁকফোকর

তবু আমি গল্প বলি
ভালোবাসার গল্প শোনাই অবিশ্রান্ত
আবার সুস্থ হও মৃন্ময়ী, জেগে ওঠো
খোকা আসবে আমাদের সংসারে

পরস্পর

কাঁচের জানালার এপিঠে এক যুবক
জ্যোৎস্নার ভেতর তার ময়ূরপঙ্খী
নদীর রঙ ঈষৎ স্বর্ণাভ
তাকে ঘিরে গাছপালা, উঁচু উঁচু টিবি এবং
প্রাসাদের খিলানশ্রেণী

কাঁচের জানালার ওপিঠে এক রূপসী
তার খোপায় সাজানো বেলকুঁড়ি
ঘরের রঙ ঈষৎ নীলাভ
তাকে ঘিরে ফুলদানি, রজনীগন্ধার স্টিক এবং
প্রাসাদের আকাশ দীপ

কাঁচের জানালার এপিঠে এবং ওপিঠে পরস্পর নির্নিমেষ
সাদা সাদা ঢেউ

ব্যক্তিগত

এই নদী, স্বপ্নের ভেতর আমার শিয়রে উঠে আসে
জলের-কল্লোলে ভেসে যায় শরীর।
বসে থাকে জেগে, এই হাত দুটি নেড়ে দেয় তাহার চিবুক
নক্ষত্র বসানো আকাশের পরিমাপ মতো তাকে ভালবাসি
আরক্ত জরুল আর ওষ্ঠপ্রান্তে ছুঁয়ে দিই ঠোঁট
ফুলের সৌরভে মাতাল বাতাসের ঢেউ টালমাটাল।

বুক চিরে আমি তাকে ভালোবাসি
এঁটো করি, নিবিড় করি তাকে।

উপবিষ্টা

কাগজে সাদা মুখ ফুটলেই
আমি আঁকব।
প্যাস্টেলের রং, রেখায় সে হয়ে উঠবে নৈসর্গিক
অমল ধবল মেঘের ভেতর জলছবি

প্রথম সংকলনের পরে
আরো বেশি গদ্যময়—আরো বেশি কি আন্দোলিত
তোমার মগ্নরাগ
কিংবা নম্রতা বিষয়ক অন্যমন?

কাগজে সাদা মুখ ফুটলেই
আলোড়িত হবে।

প্যাস্টেলের রং রেখায় সে ক্রমশঃই প্রস্ফুটিত
হ্রদের কাছে একাকী উপবিষ্টা

মনোজ রাউত (১৯৫৭)

দুঃখিত, মার্জনা করো

'দুঃখিত, মার্জনা করো'—এই মর্মে তৎকালীন যে
দু'চার ছত্র পাঠিয়েছিলাম তার কিছু মনে পড়ে এখনো—
কলেজ এলাকায় বৃষ্টি হ'লে ল্যাম্প পোষ্ট ছুঁয়ে ভারী সুন্দর
ভিজে যায় চুল তোমার, আবছা মুখ ভেজে, সন্তর্পনে
আলাভোলা ঠোঁট—এমন বর্ষার দিনে
ঘাসের অদ্ভুত সবুজ জেনে তুমি বাঙ্ময় হও সহসা—
মৃদু উদযাপনে ভেসে ওঠে ক্রোধ ও লালিমা, দূরে কেন
এই রকম, অনবরত পাপ খোঁজা······

ঘরের ভেতর নতুন কিছু, এখন বাসাবাড়ি
তুমুল উতরোলে কেঁপে ওঠে বুক, জলচ্ছবি
পুরানো ঐতিহ্যে কি খুজছো অই সাদা বিভ্রম
অইখানে চলে গেলে, বেলা হবে বড় বেশি
ভুল থেকে লো লো শিখা চেপে ধরবে হা······

প্রভু পার করো হে

মানুষের কাছে বসে থেকে তুমি সুখ পাওনি
নার্সিংহোমে নীরবতা খোঁজ ওহে করাতকলের মালিক
বিপন্ন শঙ্খ বাজে না অনেকদিন, মনে পড়ে না
শৈশবের নিজস্ব লিপি আর
অথচ বিদ্যাসাগরের কাছে ঋণ ফুরোবার নয়

যদিও প্রকৃত মাতালকে এখনও আমার
ভালোবাসতে ইচ্ছে করে
মদ্যপানের নীরক্ত ছবির নীরবতায় বেড়ে ওঠে
ঘাস, গুল্মলতা। জলপাই শহর থেকে ছুটে আসে
জলপাইবর্ণের শাড়ি, ঐ শাড়িতে হাত রাখতেই
উন্মাদনায় জেগে উঠি, সে বড় সুখের সময়—

আহ্‌ পিতা!
স্বাতীর আঙ্গুলে ছবি ভাসে, নীল লণ্ঠনে ভেসে ওঠে খ
পবিত্র শঙ্খের কাছে ঋণী থাকি, জন্মাবধি।
নতুন সিঁদুরে খুঁজি পরিত্রাণের প্রিয় বর্ণমালা।
পাথরের চেয়েও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠি ফসলের গোপন দুঃখে,
ছিঁড়ে যেতে থাকে নির্মল আভরণ।
তার অহংকারে হাত রাখি, ছুঁয়ে দিই আলবৃত্ত
শিল্পের কাছে জেগে থাকে স্বপ্নময় ক্ষুধা
স্বাতীর আর হয়ে ওঠা হয় না প্রভু—

এইদিন

মানুষের কাছে অন্ধকার হয়ে বসে থাকো তুমি, উদগ্রীব
শ্লেষ্মায় বুক ঠেসে যায়—আলো নেই, এমন হাহাকার

মেঘ নেই অনেক দিন, বর্ষা আসেনি…
দ্রাঘিমা রেখায় আলোকপাত করেছ তুমি, ভিক্ষা জোটেনি

তুমি তো ছিলে দীপান্তরে আলোকাদি ও আমাদের সমষ্টি উন্নয়ন
এখন প্রতিদিন মধ্য বুকে খেলা করে কি অন্য নিমন্ত্রণ।

শীতের কবিতা

এই শীতে তার দীর্ঘশ্বাস ছুঁয়ে যায়
কণ্ঠনালী। মজ্জাগত চুম্বনের ছবি
ভেসে ওঠে, এই শীতে, বারবার

এই শীতে তার গোপন প্রেমপত্র খুলে দেখি
অন্দরে ও বাইরে অধিকৃত শীত
হরফ ছুঁয়ে থাকে স্বপ্ন ও সারাৎসার
সঙ্গোপনে তুলে নিই বর্ণের ওষ্ঠ
প্রেম ও পরাক্রম জেগে ওঠে শরীরে
নদীর ছলাৎছল অবিরত ঘরে ও বাইরে

শব্দে জড়িয়ে আছে অন্তর্ভূত শস্য
পর্ষদের টেণ্ডারে মুখ বুঁজে পড়ে থাকে
পুরানো প্রেম, গোপন অহংকারে
খুলি না কোরেজ…

যাবো

বেড়াতে যাও যখন সাবলীল ক্রতু উচ্চারণে
হিমানী দাঁড়িয়ে থাকে অই দূরে বাস্তায় শিল্পরীতির মতো
তুমি ছিলে একদিন এইরকম পার্শ্বস্থ বৃক্ষের উচ্চারণ
অবলীলায় শুদ্ধ প্রবহমান নীরবতা একা খেলা করে
নৈঋতে ও প্রবাহে···

আমাদেরও খেলা ছিল, জাহাজে, বেলা অবেলায়
নদীর নিয়ন্ত্রণ ছিল উপমার বুকে
অলংকার আজ নয়, কারুকার্যে শিল্প আছে

মেটেলি উপসংহার টেনেছ এত আগে
ওখানে দেশী মদ টানছে মদেশীয়া যুবক যুবতী
মাদল বাজলেই উৎসবে যাবো আমরা
কলঙ্কিনী তুমি অরুন্ধতী
সিক্ত উচ্চারণে সবিতার কাছে যাবো
তোমাকে দেবো তিল ও তণ্ডুল, আগামীঃ পৃথিবী
রহস্যজনকভাবে বিজ্ঞানের বল ছুঁড়ে দেবে প্রকৃতিবিজ্ঞানী
হারে রে···তখনও জঙ্গলে সারাদিন, উৎপাত···

সমাপ্ত